জীববিজ্ঞান

রচনায়

ড. দিলরুবা পারভীন

পি এইচ.ডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম.এসসি (উদ্ভিদবিজ্ঞান) প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান

বি.এসসি (অনার্স) প্রথম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়

কোষ ও এর গঠন
CELL AND CELL STRUCTURE

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহ (Key Words)

কোষ	কোষবিদ্যা	প্লাজমোডেসমাটা	লিপোপ্রোটিন
হিস্টোন	ননহিস্টোন	পেলিকল	ইউক্রোমাটিন
হেটারোক্রোমাটিন	নিউক্লিক এসিড	নিউক্লিওসাইড	নিউক্লিওটাইট
DNA রেপ্লিকেশন	জেনেটিক কোড	ট্রান্সশ্লেষণ	ট্রান্সক্রিপশন

কোষ (Cell)

ইংরেজী ভাষায় Cell (ল্যাটিন Cellula অর্থ ছোট ঘর) (কুঠুরী, প্রকোষ্ঠ, মৌমাছির ঘর) শব্দটি এসেছে গ্রীক kytos- ফাঁকা আধার বা স্থান থেকে। বৃটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke) ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে Cell শব্দটিকে বিশেষ অর্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার ও প্রয়োগ করেন যার বাংলা পরিভাষা কোষ। Cell বা কোষ হল জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক। এককোষী বা অকোষী জীবদেহ একটিমাত্র কোষ নিয়ে গঠিত। কিন্তু বহুকোষী জীবদেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি। এ অসংখ্য কোষ সমষ্টির মিলিত প্রয়াসেই বহুকোষী জীবদেহের সমস্ত জৈবনিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। জীবনের উৎপত্তি, অবস্থান, জৈবিক কার্যাবলি, বিবর্তন সবই কোষ ভিত্তিক।

Robert Hooke, 1665

উদ্ভিদ কোষ

উদ্ভিদ কোষ

উদ্ভিদ কোষ

প্রাণিকোষ

প্রাণিকোষ
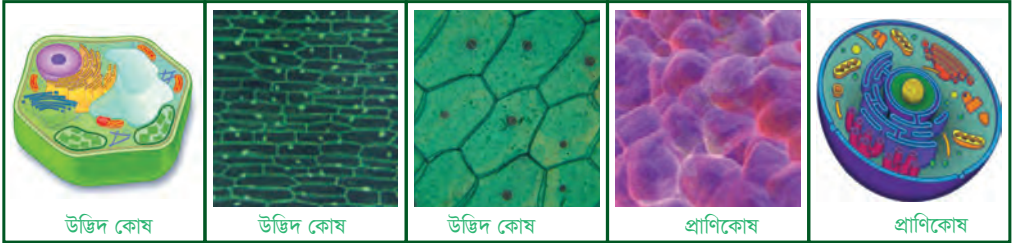
চিত্র : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের কোষ

দৈহিক গঠন, জীবনযাত্রা প্রণালী ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের দিক থেকে বিবেচনা করে কোষের একাধিক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে।

i) Swanson I Webster (১৯৭৮) এর মতে জীবনের ভৌত সত্তার মৌলিক একককে কোষ বলে।

ii) De Robertis (১৯৭৮) এর মতে জীবদেহের গাঠনিক ও জৈবনিক কার্যনির্বাহী একককে কোষ বলে।

iii) ১৯৮৩ সালে লোয়ী এবং সিকেভিজ (Loewy and Sickevitz) নামক দুজন কোষবিজ্ঞানীর মতে অর্ধ প্রবেশ্য পর্দা দ্বারা আবৃত এবং অন্য জৈবতন্ত্রবিহীন মাধ্যমে স্বপুনরুৎপাদনে সক্ষম জীবক্রিয়ার এককের নাম কোষ।

iv) আধুনিক কালের ধারণা অনুযায়ী, "প্লাজমা পর্দাবেষ্টিত এবং নিউক্লিয়াস নিয়ন্ত্রিত একখণ্ড সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলে"।

কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক যা স্বনির্ভর ও আত্মপ্রজননশীল, প্রভেদভেদ্য পর্দা দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রোটোপ্লাজম নিয়ে গঠিত এবং পূর্বতন কোষ থেকে সৃষ্ট।

কোষ বিদ্যা : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোষের পদার্থিক বা ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, জৈবিক কার্যাবলি, বিকাশ, পরিস্ফুরণ, কোষ অঙ্গাণুর গঠন এবং বিভাজন দ্বারা পূর্বতন কোষ থেকে নতুন কোষের উৎপত্তি প্রভৃতি অর্থাৎ এক কথায়, কোষ সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বা Cytology বলা হয়।

কোষের প্রকারভেদ (Types of cell): ১৯৪৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফট (Fott) কোষের নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষকে দু ভাগে ভাগ করেছেন, যথা: আদিকোষ (Prokaryotic cell) এবং প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) ।

(i) আদি কোষ (Prokarytic cell) ঃ যে সব কোষে সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস নেই সেই কোষকে আদি কোষ বলা হয়। আদি কোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোসোম ব্যতীত অন্য কোন ক্ষুদ্রাঙ্গ (যথা মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডি, প্লাস্টিড, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি) থাকে না। সাধারণত ফিশান (Fission) অথবা অ্যামাইটোটিক পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন সম্পন্ন হয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল এর কোষ আদিকোষের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ।
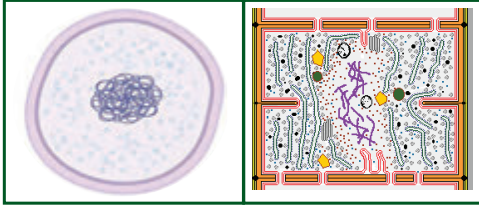
চিত্র : আদি কোষ
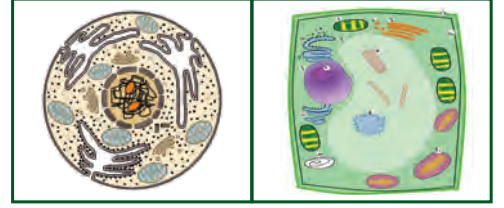
চিত্র : প্রকৃত কোষ

(ii) প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) ঃ Eukaryotic শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ eu = good; karyon = nucleus অর্থাৎ ভাল নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ। জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট যে সব কোষে সুগঠিত ও সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস বিদ্যমান সেই কোষকে প্রকৃত কোষ বলা হয়।

শারীরবৃত্তীয় কাজের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে একটি বহুকোষী জীবের কোষগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায় :

১। **দেহকোষ (Somatic cell):** বহুকোষী যেসব কোষ শুধু জীবদেহ গঠন করে, জনন কাজে অংশগ্রহণ করে না, সেগুলোকে দেহকোষ বলে। মাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় পুরনো দেহকোষ থেকে নতুন দেহকোষ সৃষ্টি হয়।

২। **জনন কোষ বা গ্যামিট (Reproductive cell বা Gamete) :** বহুকোষী জীবের যেসব কোষ শুধু জনন কাজে অংশগ্রহণ করে, সেগুলোকে জননকোষ বলে। জননকোষ দুরকমের, যথা: শুক্রাণু ও ডিম্বাণু। এরা মিয়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে শুক্রাণু মাতৃকোষ ও ডিম্বাণু মাতৃকোষ থেকে সৃষ্টি হয়।

চিত্র : দেহ কোষ

চিত্র : জনন কোষ

কোষের নিউক্লিয়াসে উপস্থিত ক্রোমোসোমের সংখ্যার ভিত্তিতে কোষ প্রধানত দুপ্রকার। যথা :

১। **ডিপ্লয়েড কোষ (Diploid cell):** এসব কোষের নিউক্লিয়াসে দুসেট (2n) ক্রোমোসোম থাকে। প্রতিসেট ক্রোমোসোমকে একত্রে জিনোম বলে। সুতরাং, ডিপ্লয়েড কোষে দুসেট জিনোম থাকে। সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষ ডিপ্লয়েড (2n) অর্থাৎ দুসেট জিনোমবিশিষ্ট।

শিক্ষার্থীর কাজ: কোষ কত প্রকার ও কী কী? জিনোম কাকে বলে?

২। হ্যাপ্লয়েড কোষ (Haploid cell): যৌন প্রজননকারী প্রাণিদের দেহে পুরুষ ও স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয়। এসব কোষ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোমবিশিষ্ট একক এবং চলনক্ষম (motile), হ্যাপ্লয়েড পুরুষ ও স্ত্রী গ্যামিট অর্থাৎ শুক্রাণু (n) এবং ডিম্বাণুর (n) নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট এবং ভ্রূণানু (2n) গঠিত হয়ে শিশুজীবের জীবনের সূচনা হয়।

শিক্ষার্থীর দলীয় কাজ: আদিকোষ ও প্রকৃতিকোষ, হ্যাপ্লয়েড কোষ ও ডিপ্লয়েড কোষের তুলনা কর।

কোষের আকৃতি (Shape of the cell): কোষের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। প্রজাতি এবং অঙ্গভেদে কোষের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোষের আকৃতি পরিবর্তনশীল বা স্থির হতে পারে। *Amoeba* এবং লিউকোসাইট (Leucocyte) কোষের আকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। এমনকি একই অঙ্গের কোষের মধ্যে আকৃতিগত তারতম্য দেখা যায়। সাধারণত: কোষের কাজের সাথে তার আকৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া কোষের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ কোষের আকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। অপরিণত উদ্ভিদকোষ সাধারণত খুব ছোট ও গোলাকৃতির হয়ে থাকে। পরিণত উদ্ভিদকোষ গোলাকার যেমন- প্যারেন কাইমা, ডিম্বাকার যেমন-প্যারেন কাইমা, ষড়ভুজাকার যেমন- স্ক্লেরেন কাইমা, স্তম্ভাকার যেমন- জাইলেম ভেসেল, নলাকার যেমন- জাইলেম, তারকাকার যেমন- স্টোনকোষ, প্রভৃতি হয়ে থাকে।

চিত্র : বিভিন্ন আকৃতির উদ্ভিদকোষ
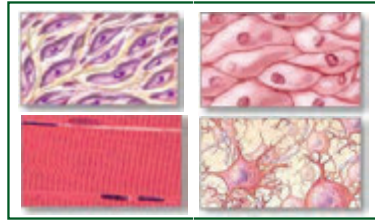
চিত্র : বিভিন্ন আকৃতির প্রাণিকোষ

প্রাণিকোষগুলি সাধারণত চ্যাপ্টা আকৃতির (Flattened) যেমন- আঁইশাকার এপিথেলিয়াম, এন্ডোথেলিয়াম এবং এপিডার্মিসের উপরের স্তরের কোষ, ঘনক আকৃতির (Cuboidal) যেমন- থাইরয়েড গ্রন্থির ফলিকলসমূহের কোষ, স্তম্ভাকৃতির (Columner) যেমন- অন্ত্রের ভেতরের তলের আবরণী কোষ, চাকতি আকৃতির (Discoidal) যেমন- স্তন্যপায়ীর লোহিত কণিকা, বর্তুলাকৃতির (Spherical) যেমন- অনেক প্রাণীর ডিম (Eggs), মাকু আকৃতির (Spindle Shaped) যেমন- মসৃণ পেশিতন্তু, লম্বা আকৃতির (Elongated) যেমন- স্নায়ু কোষ, শাখান্বিত (Branched) : ত্বকের রঞ্জক কোষ হয়ে থাকে।

কোষের আয়তন (Size of the cell) : কোষ সাধারণত আণুবীক্ষণিক। এদের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন নেই। কোষের আকার সাধারণত ১০-১০০ µm পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত ০.১ মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম কোষ (উদাহরণ: *Mycoplasma* নামক PPLO = Pleuropneumonia like Organism) দেখা গেছে। বেশিরভাগ জীবকোষ খালিচোখে দেখা যায় না। এদের দেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু কোষ খালি চোখে দেখা যায়, যথা: পাখির ডিম। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কোষ হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্নায়ুকোষ যা শাখা প্রশাখাসহ দৈর্ঘ্যে ১ মিটারেরও বেশি হয়।

কোষ পরিমাপের একক (Units of Cell Measurement) : কোষ পরিমাপের একক হিসেবে মাইক্রোন (µ) ও অ্যাংস্ট্রম (Å) এর পরিবর্তে বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে মাইক্রোমিটার (µm) এবং ন্যানোমিটার (nm) ব্যবহৃত হয়।

১ মাইক্রোমিটার (µm) = ১ মাইক্রোন (µ) = ০.০০১ মিলিমিটার (mm)

১ ন্যানোমিটার (nm) = ০.০০১ মাইক্রোমিটার (µm) = ১০ অ্যাংস্ট্রম (Å)

শিক্ষার্থীর কাজ: বিভিন্ন আকৃতির কোষের নাম লিখ।

কোষের সংগঠন (Structure of Cell)

জীবদের যেমন বৈচিত্র্যতা আছে তেমনি তাদের কোষের গঠনে বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। গঠন বৈচিত্র্যতা থাকলেও কোষের মধ্যে সাদৃশ্যতা থাকে। বর্ণনার সুবিধার জন্য আদর্শ কোষের (typical cell) কল্পনা করা হয়েছে যার মধ্যে কোষের সব উপাদান এবং কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে।

উদ্ভিদ কোষের সংগঠন (Structure of Plant Cell) :

কোষপ্রাচীর
সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (মসৃণ)
মাইটোকন্ড্রিয়ন
পিনোসাইটিক ফোস্কা
কূপ/পিট
কোষ গহ্বর
নিউক্লিয়ার মেমব্রেন
নিউক্লিয়ার রন্ধ্র
নিউক্লিওলাস
নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম
নিউক্লিয়াস
নিউক্লিওপ্লাজম
ক্লোরোপ্লাস্ট
সাইটোপ্লাজম
গলগিবডি
মাইক্রোটিউবিউলস্‌
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (অমসৃণ)
রাইবোসোম (মুক্ত)
লাইসোসোম

চিত্র : ১.১ ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের গঠন
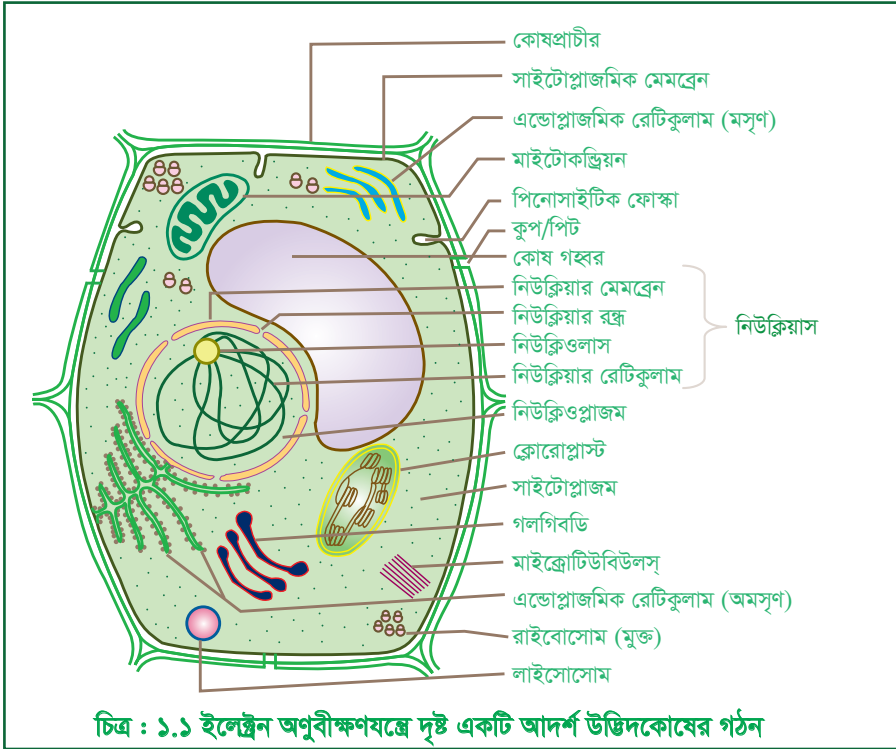
উদ্ভিদ কোষ একই রকম হয় না। একটি বহুকোষী উদ্ভিদের বিভিন্ন টিশ্যুর কোষও ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়। কাজেই কোন একটি নির্দিষ্ট কোষে, কোষের সব গঠন ও উপাদান ও ক্ষুদ্রাঙ্গ নাও থাকতে পারে। তাই একটি কোষে সব উপাদান ও ক্ষুদ্রাঙ্গের উপস্থিতির ভিত্তিতে তাকে আদর্শ উদ্ভিদকোষ বলা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ: উদ্ভিদকোষের কোষঅঙ্গাণুগুলির নাম বল।

একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ যে সকল অঙ্গ ও অঙ্গাণু দ্বারা গঠিত তা ছকের মাধমে উপস্থাপন করা হল ঃ

আদর্শ উদ্ভিদকোষ

- A. জড় বস্তু
  - ক. কোষ প্রাচীর
  - খ. কোষস্থ নির্জীব
    - ১. কোষগহব্বর
    - ২. সঞ্চিত পদার্থ
      - (i) কার্বোহইড্রেট
      - (ii) প্রোটিন
      - (iii) লিপিড
    - ৩. নিঃসৃত পদার্থ
      - (i) এনজাইম
      - (ii) পিগমেন্ট
      - (iii) নেকটার ইত্যাদি
    - ৪. বর্জ্য পদার্থ
      - (i) ট্যানিন
      - (ii) রেজিন
      - (iii) গাম
      - (iv) ল্যাটেক্স
      - (v) অ্যালকালয়েড
      - (vi) জৈব অ্যাসিড
      - (vii) উদ্বায়ী তেল
      - (viii) খনিজ কৃষ্টাল ইত্যাদি
- B. প্রোটোপ্লাজম (কোষস্থ সজীব বস্তু)
  - ক. কোষঝিল্লী
  - খ. সাইটোপ্লাজম
    - ১. সাইটোমাতৃকা
    - ২. বিভিন্ন অঙ্গাণু
      - (i) প্লাস্টিড
      - (ii) মাইটোকন্ড্রিয়া
      - (iii) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম
      - (iv) রাইবোসোম
      - (v) গলগি বস্তু
      - (vi) লাইসোসোম
      - (vii) সেন্ট্রিওল
      - (viii) গ্লাইঅক্সিসোম
      - (ix) মাইক্রোটিউবিউলস
  - গ. নিউক্লিয়াস
    - (i) নিউক্লিয়ঝিল্লী (নিউক্লিয়ার মেমব্রেন)
    - (ii) নিউক্লিয়োপ্লাজম
    - (iii) নিউক্লিয়োলাস
    - (iv) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোসোম

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
উদ্ভিদ কোষের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।	উদ্ভিদকোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: উদ্ভিদকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে একটি পোস্টার তৈরি করে আনো।

প্রাণিকোষের সংগঠন (Structure of Animal Cell) :

প্রাণিকোষ

- A. কোষঝিল্লী বা প্লাজমা মেমব্রেন
- B. প্রোটোপ্লাজম
  - a. সাইটোপ্লাজম
    - i. সাইটোসল
      - ১. এক্টোপ্লাজম
      - ২. এন্ডোপ্লাজম
    - ii. কোষীয় অঙ্গাণু
      - ১. মাইটোকন্ড্রিয়া
      - ২. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম
      - ৩. গলগি বডি
      - ৪. লাইসোসোম
      - ৫. রাইবোসোম
      - ৬. পারঅক্সিসোম
    - iii. কোষীয় জড় পদার্থ
      - ৭. ভ্যাকুওল
      - ৮. ভেসিকল
      - ৯. সেন্ট্রিওল
      - ১০. মাইক্রোফিলামেন্টস
      - ১১. মাইক্রোটিউবিউলস
  - b. নিউক্লিয়াস

চিত্র ঃ ১.২ একটি আদর্শ প্রাণিকোষ (ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট)
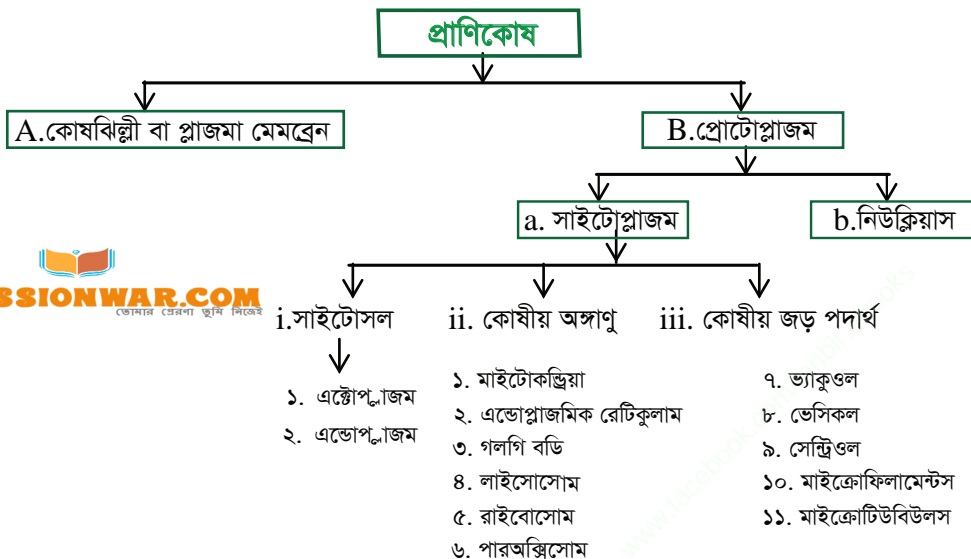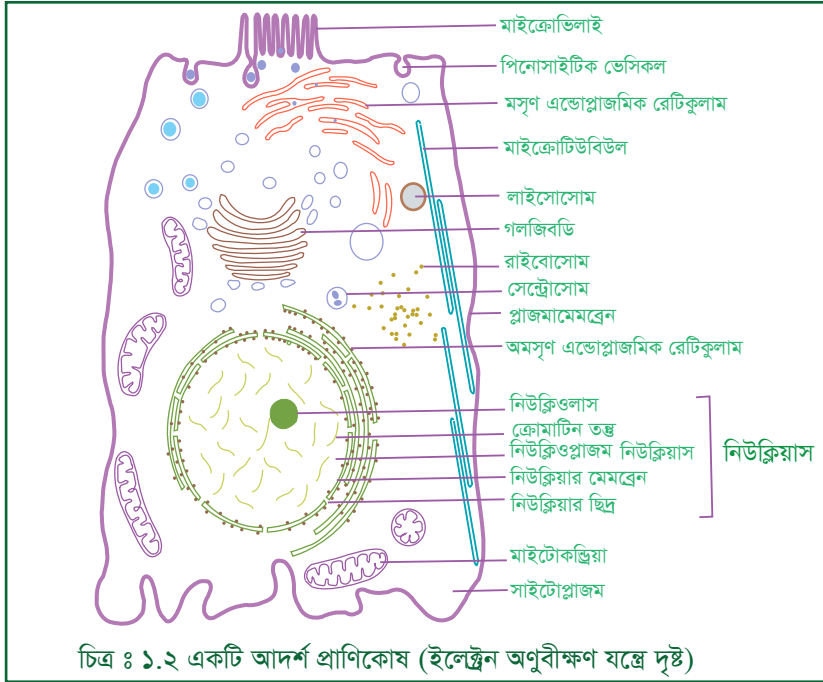
শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
প্রাণিকোষের অঙ্গাণুর নামগুলো কী কী?	প্রাণিকোষের অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে একটি পোস্টার তৈরি করে আনো।

কোষ প্রাচীর

কোষপ্রাচীর (Cell wall) ঃ এটি শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে দেখা যায়। প্রাণীকোষে কোষ প্রাচীর অনুপস্থিত। উদ্ভিদকোষের ঝিল্লীকে ঘিরে অবস্থিত, কোষের সজীব অংশ থেকে ক্ষরিত এবং সেলুলোজ ও লিগনিন বা কাইটিন দিয়ে গঠিত শক্ত, পুরু ও ছিদ্রযুক্ত জড় আবরণীকে কোষপ্রাচীর বলে। রেণু ও গ্যামিট ছাড়া সকল উদ্ভিদকোষে এ প্রাচীর উপস্থিত। কোষের অবস্থান ও বয়স ভেদে কোষপ্রাচীর সূক্ষ্ম অথবা স্থূল এবং মসৃণ বা কারুকার্যময় হতে পারে। কোষপ্রাচীরের গঠন ও আকৃতি সাধারণত কোষের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের ভিন্নতার উপরেই নির্ভরশীল। রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোষ দেখেছিলেন তা ছিল মূলত কোষপ্রাচীর।

চিত্র : ১.৩ কোষ প্রাচীরের গঠন

ভৌত গঠন ঃ কোষপ্রাচীর উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সাইটোপ্লাজম নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তু নিয়ে গঠিত হলেও কোষপ্রাচীর নির্জীব বা জড়। একটি বিকশিত কোষপ্রাচীরকে প্রধানত তিনটি ভিন্ন স্তরে (layers) বিভক্ত দেখা যায়। এর প্রথমটি

হল মধ্যপর্দা বা middle lamella। মাইটোটিক কোষ বিভাজনের টেলোফেজ (tolophase) পর্যায়ে এর সূচনা ঘটে। সাইটোপ্লাজম থেকে আসা phragmoplast এবং গলগি বডি থেকে আসা পেকটিন জাতীয় ভেসিকলস্ (vesicles or dropplets) মিলিতভাবে মধ্যপর্দা সৃষ্টি করে। পেক্টিক অ্যাসিড বেশি থাকার কারণে এটি প্রথম দিকে জেলির মত থাকে। মধ্যপর্দা দুই কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ পর্দা। এটি বিগলিত হয়ে গেলে দুটি কোষ পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তরটি হল প্রাথমিক প্রাচীর (primary wall)। মধ্যপর্দার উপর সেলুলোজ (cellulose), হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) এবং গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoprotein) ইত্যাদি জমা হয়ে একটি পাতলা স্তর (১ – ৩ μm পুরু) তৈরি করে। এটি প্রাথমিক প্রাচীর। মধ্যপর্দার ভেতরের সার্ফেসে এটি তৈরি হয়। কোন কোন কোষে (যেমন ট্রাকিড, ফাইবার ইত্যাদি) প্রাথমিক প্রাচীরের উপর আর একটি স্তর তৈরি হয়। এটি সাধারণ কোষের বৃদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হবার পর ঘটে থাকে। এ স্তরটি অধিকতর পুরু (৫ – ১০ μm)। এতে সাধারণত সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়। একে সেকেন্ডারি প্রাচীর (secondary wall) বলা হয়। ভাজক কোষ এবং অধিক মাত্রায় বিপাকীয় অন্যান্য কোষে সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হয় না। সেকেন্ডারি প্রাচীর তিনস্তরবিশিষ্ট হয়।

কূপ এলাকা (Pit fields) ঃ এটি হল প্রাচীরের সবচেয়ে পাতলা (thin) এলাকা। দুটি পাশাপাশি কোষের কূপও একটি অপরটির উল্টোদিকে মুখোমুখি অবস্থিত এবং কূপ দুটির মাঝখানে কেবল মধ্যপর্দা থাকে। দুটি পিট জোড়ের মধ্যেকার প্রাচীর (প্রাইমারি কোষপ্রাচীর + মধ্য ল্যামেলা)–কে পিট মেমব্রেন (pit membrane) বলে। মুখোমুখি দুটি কূপকে পিট পেয়ার (pit pair) বলে। কূপ অঞ্চলে প্রাথমিক প্রাচীর গঠিত হয় না। সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হলে কূপ পাড়হীন অথবা পাড়যুক্ত (bordered pit) হতে পারে।

প্রাচীর রন্ধ্র ঃ কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন স্তরসমূহ অবিচ্ছন্ন না থেকে মাঝে মাঝে ছিদ্রযুক্ত হয়। ছিদ্রাল অংশটুকু কেবল মধ্য ল্যামেলা দিয়ে পৃথক থাকে। ছিদ্রগুলো প্রাথমিক পিট ফিল্ড (primary pit field) নামে পরিচিত। পাশাপাশি থাকা দুটি কোষের মধ্যে কোষ প্রাচীরের কূপ অংশে সাইটোপ্লাজমের যোগসূত্র রচনার স্থানকে প্লাজমোডেসমাটা (plasmodesmata) বলে। পিট দু'রকম, যথা – অপাড় বা সরল (simple) এবং সপাড় (bordered)। কিনারাবিহীন পিটকে অপাড়পিট এবং সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীরের বস্তু জমা হওয়ায় সৃষ্ট কিনারাযুক্ত পিটকে সপাড় পিট বলে।

অনেক ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ কোষপ্রাচীরে বস্তু জমা হয়, ফলে পাড়ের মধ্যাংশটি পিট নালা (pit canal)-য় পরিণত হয়। অনেক কোষে পিট মেমব্রেন চাকতির মতো স্থুল হয়, একে টোরাস (torus) বলে। অপাড় পিট পুরু প্রাচীরের প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা কোষে এবং সপাড় পিট জাইলেমের ট্রাকিড ও ভেসেল কোষে পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজঃ কোষ প্রাচীর কী? পিট কী?

রাসায়নিক গঠন ঃ মধ্যপর্দায় অধিক পরিমাণে থাকে পেক্টিক অ্যাসিড। এ ছাড়া থাকে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম পেক্টেট্ এবং ম্যাগনেসিয়াম পেক্টেট্ লবণ– যাকে পেক্টিন বলা হয়। এ ছাড়াও অল্প পরিমাণে থাকে প্রোটোপেক্টিন (protopectins)। প্রাথমিক প্রাচীরে থাকে প্রধানত সেলুলোজ (cellulose); হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) এবং গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoproteins)। হেমিসেলুলোজ- G xylans, arabans, galactans ইত্যাদি থাকে।

সূক্ষ্ম গঠন ঃ কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান হল সেলুলোজ। প্রায় একশ সেলুলোজ চেইন মিলিতভাবে একটি ক্রিস্টালাইন মাইসেলিস (micelles) গঠন করে। মাইসেলিসকে কোষপ্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক ধরা হয়। প্রায় ২০টি মাইসেলি মিলে একটি মাইক্রোফাইব্রিল (microfibril) গঠন করে এবং ২৫০টি মাইক্রোফাইব্রিল মিলিতভাবে একটি ম্যাক্রোফাইব্রিল (macrofibril) গঠন করে। এর ব্যাস প্রায় ০.৪μm। ম্যাক্রোফাইব্রিল হচ্ছে প্রাইমারি কোষপ্রাচীরের গঠনাকৃতি।

কোষপ্রাচীরের কাজ ঃ কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে। বাইরের পরিবেশ থেকে সজীব প্রোটাপ্লাজমকে সার্বিকভাবে রক্ষা করে। কোষের দৃঢ়তা দান করে। কোষ বিভাজনের ধারা বজায় রাখে ও বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। পিট অংশে প্লাজমোডেসমাটা সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং কোষগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করে থাকে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
কোষ প্রাচীর কী?	কোষ প্রাচীরের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: কোষ প্রাচীরের কাজগুলি লিখে আন।

কোষঝিল্লী বা প্লাজমা মেমব্রেন (Cell membrane or Plasma membrane)

বিজ্ঞানী C. Nageli এবং C. Cramer ১৮৫৫ সালে সর্বপ্রথম Cell membrane শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী J. Q. Plowe, ১৯৩১ সালে একে Plasmalemma নামে অভিহিত করেন।

সব উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সজীব, পাতলা, স্থিতিস্থাপক, অর্ধভেদ্য ও অতিসূক্ষ্ম আবরণী দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে, একে কোষঝিল্লী বা কোষ আবরণী বা প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমালেমা (Cell membrane or Plasmamembrane or Plasmalema) বলে। প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে এটি কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে। কোষঝিল্লী কোষের সব স্থানে সমান নয়। কখনও এটির আঙ্গুলের মতো উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়। এগুলোকে মাইক্রোভিলাই (Microvilli) বলে। কোষ অভ্যন্তরে অধিক প্রবিষ্ট মাইক্রোভিলাসকে পিনোসাইটিক ফোস্কা বলে। যকৃত কোষ, জরায়ু কোষ, খাদ্যনালীর প্রাচীর কোষ, পিত্তাশয়ের আবরণী কোষ ইত্যাদিতে মাইক্রোভিলাই থাকে।

উৎপত্তি : সাইটোপ্লাজমীয় বহিঃস্তর পরিবর্তিত হয়ে প্লাজমামেমব্রেন গঠিত হয়।

আবিষ্কার : সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষঝিল্লীকে প্রোটোপ্লাজম থেকে পৃথক করা যায় না। আধুনিককালে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষঝিল্লীর আলট্রা গঠন (Ultra structure) সম্পর্কে নানা তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের অনেক আগে ১৯২৬ সালে বিজ্ঞানী গার্টার ও গ্রেন্ডেল (E. Gorter এবং F. Grendel) মানুষের লোহিত রক্তকণিকা (R.B.C.)-এর উপর গবেষণা করে প্লাজমা মেমব্রেনের দ্বিস্তরী লিপিড ও প্রোটিন মডেলের বর্ণনা দেন।

কোষঝিল্লীর গঠন : কোষঝিল্লীতে প্রোটিন ও লিপিড অণুর বিন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মতবাদ হলো :

১) ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদ (Theory of Danielli and Davson, ১৯৩৫) : এ মতবাদ অনুসারে কোষঝিল্লীর দুদিকে দুটি ঘন প্রোটিন স্তর থাকে এবং এর মাঝখানে হালকা লিপিড স্তরটি 'স্যান্ডউইচ' অবস্থায় থাকে। তিনটি স্তরের মোট বেধ প্রায় ১০০A^0 ।

২) রবার্টসনের একক ঝিল্লীর মতবাদ (Unit membrane theory of plasmalemma by Robertson, ১৯৫৯) : এ মতবাদের প্রবক্তা বিজ্ঞানী J.D. Robertson, (১৯৫৯)। এ মতবাদ অনুযায়ী কোষঝিল্লীর দুইদিকে দুটি ঘন প্রোটিন স্তর থাকে এবং মাঝখানে থাকে একটি দ্বি আণবিক লিপিড স্তর । প্রতিটি প্রোটিন স্তর ২০ A^0 পুরু এবং মাঝের লিপিড স্তর 35 A^0 পুরু থাকে। প্রোটিন স্তরে বিভিন্ন জাতীয় প্রোটিন বিন্যস্ত থাকে।

একক পর্দা (Unit membrane) : কোষের যেসব পর্দা প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন (P-L-P) নামক ত্রিস্তর দিয়ে গঠিত সেগুলোকে একক পর্দা বা ইউনিট মেমব্রেন বলে। বিজ্ঞানী রবার্টসন ১৯৫৯ সালে P-L-P অণু দিয়ে গঠিত ত্রিস্তর পর্দাকে একক পর্দা নামে অভিহিত করেন।

৩) সিঙ্গার ও নিকলসন এর ফ্লুইড মোজাইক মডেল (Fluid mosaic model by Singer and Nicolson) : বিভিন্ন মডেলের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণীয় মডেল হল ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (Singer and Nicolson – ১৯৭২)। এ মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লী দ্বিস্তর বিশিষ্ট। প্রতিটি স্তর ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত। উভয় স্তরের হাইড্রোকার্বন লেজটি সামনাসামনি (মুখোমুখি) থাকে এবং পানিগ্রাহী (hydrophillic) মেরু অংশ বিপরীত দিকে থাকে। ঝিল্লীর প্রোটিন অণুগুলো ফসফোলিপিড স্তরে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে। কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য উপাদানও ফসফোলিপিড মাধ্যমে এখানে সেখানে মিশে থাকতে পারে।

চিত্র : ১.৪ কোষ ঝিল্লীর ফ্লুইড মোজাইক মডেল
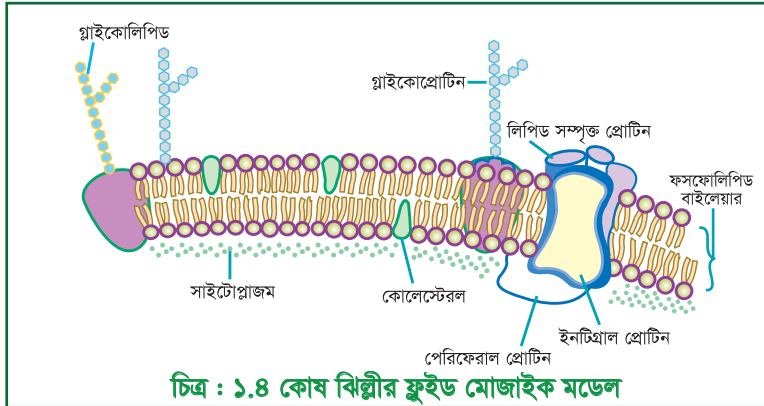
ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লীর গাঠনিক উপাদান নিম্নরূপ ঃ

(ক) **লিপিড বাইলেয়ার ঃ** এটি ফসফোলিপিড দিয়ে তৈরি। প্রতিটি ফসফোলিপিডে এক অণু গ্লিসারল থাকে এবং গ্লিসারলের সাথে দুটি ননপোলার ফ্যাটি অ্যাসিড লেজ এবং একটি পোলার ফসফেট মাথা থাকে।

(খ) **মেমব্রেন প্রোটিন ঃ** কোষঝিল্লীতে তিন ধরনের প্রোটিন শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ (i) পেরিফেরাল প্রোটিন- এগুলো ঝিল্লীর সার্ফেসে থাকে (ii) ইনটিগ্রাল প্রোটিন – এগুলো ঝিল্লীর উভয় সার্ফেস পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে এবং (iii) লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন–এগুলো লিপিড কোর-এ সম্পৃক্ত থাকে।

(গ) **কোলেস্টেরল ঃ** উদ্ভিদ কোষের ঝিল্লীতে এটি অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং প্রাণিকোষের ঝিল্লীতে এটি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

(ঘ) **গ্লাইকোক্যালিক্স ঃ** এটি ঝিল্লীর উপর একটি চিনির স্তর বিশেষ। গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়।

প্রোটিন অণুর পানিগ্রাহী (hydrophillic–যখন ঝিল্লীর সার্ফেস-এ থাকে) পোলার প্রান্ত বাইরের দিকে থাকে। পানি বিদ্বেষী নন পোলার প্রান্ত (আংশিক পানিরোধী-Hydrophobic) Lipid স্তরের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় মাঝের দিকে থাকে। পর্দার এই অর্ধতরল গঠনের কারণেই প্রোটিন অণুগুলো পর্দার মধ্যে নড়াচড়া করতে সক্ষম। বিজ্ঞানী Lee (১৯৭৫) এই fluid Mosaic মডেলকে সমর্থন করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেলমেমব্রেনে লিপিড অণুর গতিশীল অবস্থা বর্তমান। তাদের মতে সেলমেমব্রেন তরল ও অর্ধতরল প্রকৃতির। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে কোষঝিল্লীটি নিরেট নয় বরং বেশ তরল (highly fluid)। এই তরলের মধ্যে লিপিড কণাগুলো মোজাইক-এর মতো অবস্থান করে। প্রোটিনের সাথে লিপিড, প্রোটিনের সাথে প্রোটিন, লিপিডের সাথে লিপিড-এর আন্তঃক্রিয়ার ফলে সেলমেমব্রেনের গঠন ও গতিশীলতা প্রকাশ পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ: ফ্লুইড মোজাইক মডেল নামকরণের কারণ কী?

সেলমেমব্রেনে এনজাইমের কার্যকারিতা ও বিভিন্ন অণুর চলাচল মেমব্রেনস্থ প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। মেমব্রেনের ভেতরদিয়ে লিপিড অণুর অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা থাকে এবং এরা পাশে ব্যাপ্ত অবস্থায় থাকে। এরা এদের লম্বা অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে এবং এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হতে পারে। পর্দায় কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিন হতে উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদির উপস্থিতি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছুবস্তু কোষের ভিতর হতে বাইরে বের করতে এবং বাহির হতে ভেতরে প্রবেশ করতে কোষঝিল্লীর কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়, যা ফ্লুইড মোজাইক মডেলকে সমর্থন করে।

ঝিল্লীর মাধ্যমে পরিবহন ঃ উদ্ভিদ দেহের সব কর্মকাণ্ডের প্রধান স্থান হল কোষ। জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ও বিভিন্ন সংশ্লেষণ কাজের জন্য অনেক বস্তু কোষঝিল্লীর মধ্য দিয়ে বাইর থেকে ভেতরে এবং ভেতর থেকে বাইরে পরিবাহিত হতে হয়। কিন্তু কোষঝিল্লী সব বস্তুর জন্য ভেদ্য নয়, এটি বৈষম্যভেদ্য (differentially permeable) অর্থাৎ কোন কোন বস্তু এর মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হবে তা নির্দিষ্ট।

কোষঝিল্লী কর্তৃক কোন বস্তু বর্জন বা গ্রহণ করা বিভিন্ন উপাদানের (factor) উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল উপাদানগুলোর -(i) আকার (size) (ii) মেরুতা (polarity), (iii) বৈদ্যুতিক চার্জ (electric charge) এবং (iv) লিপিড দ্রবণীয়তা (lipid solubility)। সাধারণত ছোট ও অমেরু অণু (যেমন- পানি, গ্লিসারল) সহজেই ঝিল্লী অতিক্রম করে থাকে। কিছুটা বড় আকারের মেরু অণু (যেমন-গ্লুকোজ, সুকরোজ) সহজেই নিজ শক্তিতে ঝিল্লী অতিক্রম করতে পারে না। আর চার্জড অণু (যেমন-সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়ন) সাধারণত বিশেষ আয়ন ছিদ্রপথ (ion channel) বা ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের মাধ্যমে ঝিল্লী অতিক্রম করে।

ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য ঃ (i) এই প্রোটিন ঝিল্লীর এক পৃষ্ঠ থেকে অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। (ii) এই প্রোটিন সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ প্রতি প্রকার প্রোটিনের এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বিশেষ গাঠনিক স্থান (site) থাকে। যে অণুকে এই প্রোটিন পরিবহন করবে সেই অণুর গঠন আকৃতি এবং এই প্রোটিনের গাঠনিক স্থানের গঠন আকৃতি একই রকম হয়। (iii) এই প্রোটিন এর অবস্থান পরিবর্তন করে না, শুধু আকৃতি পরিবর্তন করে পরিবহন কাজ সম্পন্ন করে।

> **শিক্ষার্থীর দলীয় কাজ:** ফ্লুইড মোজাইক মডেলের গঠন ও কাজগুলো কী কী?

ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাহায্যে পরিবহন ঃ ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রয়োজনীয় অণু কোষঝিল্লীর এপার থেকে ওপারে পরিবাহিত হয় ঃ

(a) একক পরিবহন (Uniports) ঃ একটি নির্দিষ্ট পদার্থের একটি আয়ন বা অণু ঝিল্লীর এপার থেকে ওপারে পরিবাহিত হয়।
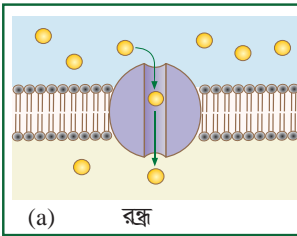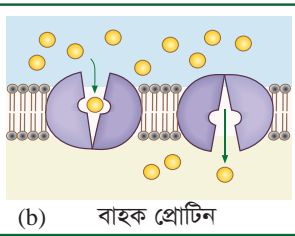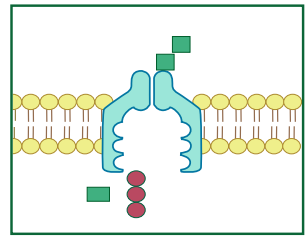
চিত্র : ১.৫ : একক পরিবহন কৌশল

চিত্র : ১.৬ : যুগ্ম পরিবহন কৌশল

যুগ্ম পরিবহন (Coports) ঃ Symports -এ দুই ধরনের পদার্থ একই দিকে পরিবাহিত হয়। একই সাথে দুই ধরনের পর্দাথের আয়ন বা অণু পরিবাহিত হয়। দুই ধরনের পদার্থ একই সময়ে বিপরীত দিকে পরিবাহিত হলে তাকে অ্যান্টিপোর্ট (antiports) বলে।

ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন কোষঝিল্লীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কিছু কিছু বস্তু ব্যাপনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। কিছু কিছু পদার্থ ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় পরিবাহিত হয়, যেমন– H^+ এর বিনিময়ে K^+, OH^- এর বিনিময়ে Cl^-। কিছু কিছু বস্তু নির্দিষ্ট বাহনের মাধ্যমে (আয়ন বাহক মতবাদ) পরিবাহিত হয় ; কিছু কিছু পদার্থ সাইটোক্রোম বাহকের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। প্রোটিনগুলো কিভাবে বিভিন্ন পদার্থ শনাক্ত করে ভেতরে প্রবেশ করায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ আছে।

১। **বাহক মতবাদ (Carrier concept) ঃ** ঝিল্লীর পৃষ্টদেশে যে প্রোটিন আছে সেগুলো কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশযোগ্য পদার্থের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক উপায়ে যোগসূত্র সৃষ্টি করে এবং তা উপযোগী হলে ভেতরে প্রবেশ করায়। এ প্রক্রিয়ায় পদার্থটি বাহক–অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে মুক্ত হলে প্রোটিন অণুটি আবার বর্হিপৃষ্ঠে চলে আসে।

২। **স্থিরচিত্র মতবাদ (Fixed pore concept) ঃ** অন্তর্নিহীত প্রোটিনগুলো অনেকটা স্থির অবস্থায় ঝিল্লীর বিভিন্ন অবস্থানে বিন্যস্ত থাকে। গ্রহণযোগ্য পদার্থ বাহক প্রোটিনের সংস্পর্শে এলে বাহক অণু গাঠনিক পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি প্রবেশ পথের সৃষ্টি করে। গ্রহণযোগ্য অণুটি তখন ক্রমে ছিদ্রপথে অগ্রসর হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং প্রোটিন অণু আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে অনুরূপভাবে প্রবেশের জন্য তৈরি হয়।

কোষঝিল্লীর রাসায়নিক উপাদান ঃ (i) কোষঝিল্লীতে প্রোটিন, লিপিড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পলিস্যাকরাইড থাকে। (ii) প্রোটিন গাঠনিক উপাদান হিসেবে (structural), এনজাইম হিসেবে (enzymes) এবং বাহক (carrier protein) হিসেবে থাকে। এদের গঠন ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। (iii) কোষঝিল্লীর মোট শুষ্ক ওজনের প্রায় ৭৫ ভাগই লিপিড।

লিপিড প্রধানত ফসফোলিপিড (phospholipids) হিসেবে থাকে। পাঁচ রকম ফসফোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে – যার সবচেয়ে সরলটি হল ফসফোটাইডিক অ্যাসিড এবং অন্য চারটি জটিল প্রকৃতির (complex)। জটিল ফসফোলিপিডের মধ্যে লেসিথিন (lecithin) প্রধান। এছাড়া গ্লিসারোফসফ্যাটিড, কোলেস্টেরলও দেখা যায়। ঝিল্লীস্থ ফসফোলিপিডের অর্ধেকের বেশি থাকে লেসিথিন। কোন কোন ক্ষেত্রে RNA (পিঁয়াজের কোষে), DNA ইত্যাদিও থাকতে পারে।

রাসায়নিক গঠন : কোষঝিল্লির প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো লিপিড ও প্রোটিন। লিপিডের মধ্যে ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল থাকে। কোষঝিল্লির রাসায়নিক উপাদানসমূহের পরিমাণ- প্রোটিন: ৬০-৮০%, লিপিড (ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল): ২০-৪০%, শর্করা: ৫%, এনজাইম: প্রায় ৩০ প্রকার, অ্যান্টিজেন, লবণ ও পানি।

কোষঝিল্লীর রূপান্তরিত অবস্থা : কোষঝিল্লী বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এতে নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের রূপান্তর দেখা যায়–

১। **মাইক্রোভিলাই (Microvilli) :** কিছু কিছু প্রাণিকোষের কোষঝিল্লী আঙ্গুলের মতো বর্ধিত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকাতির অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে। এদের মাইক্রোভিলাই বলে। এগুলো সাধারণত: অন্ত্রের এপিথেলিয়াম কোষ, বৃক্কের নেফ্রনে দেখা যায়। এদের সংখ্যা কোষপ্রতি ৩০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা কোষের শোষণতল বৃদ্ধি করে।

২। **পিনোসাইটিক ভেসিকল (Pinocytic vesicle) :** কোষঝিল্লী থেকে সৃষ্ট তরল খাদ্যকণা সমন্বিত গহ্বরকে পিনোসাইটিক ভেসিকল বলে। এগুলো সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) বলে। কিছু বিশেষ ধরনের কোষ যেমন: মানুষের ডিম্বকোষে পিনোসোম সৃষ্টি হয়।

৩। **ফ্যাগোসোম (Phagosome) :** কোষঝিল্লী থেকে সৃষ্ট ও বিচ্যুত এবং গৃহীত কঠিন বস্তু সহ আবরণীবদ্ধ সাইটোপ্লাজমীয় কণাকে ফ্যাগোসোম বলে। প্রকৃতপক্ষে এ পদ্ধতিতে কোনো কোনো কোষ ক্ষণপদ নামক অভিক্ষেপ বিস্তার করে খাদ্যবস্তু বা অন্যকিছু কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করায়। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্যকে ঘিরে এন্ডোপ্লাজমের মধ্যে ফ্যাগোসাইটিক ভেসিকল গঠিত হয়। যেমন- শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।

৪। টাইট জাংশন (Tight junction) : ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন দুটি কোষের কোষঝিল্লী অনেক সময় পরস্পর দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে টাইট জাংশন সৃষ্টি করে। কোষের এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কোনো পদার্থ যাতায়াত করতে পারে না। মস্তিষ্কের নিউরণে সাধারণত এরূপ অবস্থা দেখা যায়।

৫। ডেসমোসোম (Desmosome) : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের কোষঝিল্লী রূপান্তরিত হয়ে টনোফাইব্রিল (tonofibril) তন্তুযুক্ত পাতের মতো গঠন করে। এদের ডেসমোসোম বলে। এপিথেলিয়াম টিশ্যুতে এরূপ দেখা যায়। এরা দুটি কোষকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে।

কোষঝিল্লির কাজ : কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে। কোষের ভিতরকার সজীব অংশকে রক্ষা করে অর্থাৎ বাইরের প্রতিকূল অবস্থা হতে অভ্যন্তরীণ বস্তুকে রক্ষা করে। বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু যেমন- গলগি বডি, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ইত্যাদি সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এটি একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা যা কোষের বাইরে ও ভিতরের বস্তুসমূহর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এনজাইম ও অ্যান্টিজেন ক্ষরণ করে। শ্বসন ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজে শক্তি সরবরাহ করে। মাইক্রোভিলাই সৃষ্টি করে কোষের শোষণতল বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: ফ্লুইড মোজাইক মডেলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে একটি পোস্টার তৈরি করে আনো।

প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)

গ্রিক শব্দ protos-প্রথম, plasma-আকার থেকে Protoplosm শব্দটির উৎপত্তি। কোষের অভ্যন্তরের বর্ণহীন, অর্ধতরল, জেলির ন্যায় থকথকে, আঠালো, স্থিতিস্থাপক কলয়ডাল পদার্থ যা কোষঝিল্লি বা প্লাজমাপর্দা দ্বারা বেষ্টিত তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। একে সাইটোপ্লাজমিক ধাত্র বা cytoplasmic matrix বলা হয়। বস্তুত এর মধ্যেই নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণুসমূহ অবস্থান করে। প্রোটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবিরতভাবে চলে। বিভিন্ন প্রভাবকের প্রভাবে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটলে কোষেরও মৃত্যু ঘটে থাকে।

আবিষ্কার ও নামকরণ : বিজ্ঞানী পারকিনজি (Purkinje, ১৮৪০) সর্বপ্রথম প্রোটোপ্লাজম কথাটি ব্যবহার করেন। প্রোটোপ্লাজমই যে প্রাণের ভৌত ভিত্তি সে সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন বিজ্ঞানী ম্যাক্স সুল্জ (Max Schultze, ১৮৬৩) এবং টমাস হাক্সলে (Thomas Huxley, ১৮৬৮)।

চিত্র : প্রোটোপ্লাজম

ভৌত গঠন : প্রোটোপ্লাজম একটি অর্ধ স্বচ্ছ, বর্ণহীন, সান্দ্র বা আঁঠালো, স্থিতিস্থাপক, সংকোচনশীল, ধাত্র পদার্থ। এটি সব সময় প্রচুর পরিমাণে পানিতে সম্পৃক্ত থাকে, এমনকি ৯৮% পর্যন্ত পানি থাকতে পারে। প্রোটোপ্লাজমের গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কিছু মতবাদ নিম্নরূপ :

১) জালিকা (reticulate) তত্ত্ব : এ ধারণা অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে প্রোটোপ্লাজম অনেক সুক্ষ্ম জালি দিয়ে গঠিত।

২) অণুতন্তু (fibrillar) তত্ত্ব : বিজ্ঞানী ফ্লেমিং এর মতে, প্রোটোপ্লাজম অনেক অতি ক্ষুদ্র তন্তু বা অণুতন্তু দিয়ে গঠিত।

৩) দানাদার (granular) তত্ত্ব : বিজ্ঞানী আলট্ম্যান (Altman,১৮৮৬) এর মতে, বিভিন্ন রকম ছোটবড় দানা বা কণা দিয়ে প্রোটোপ্লাজম গঠিত।

৪) ফুসকা বা বুদ্‌বুদ্‌ (alveolar) তত্ত্ব : বিজ্ঞানী বুটস্‌লি (Butschli, ১৮৯২) এর মতে, প্রোটোপ্লাজম অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্‌কা বা বুদ্‌বুদ্‌ দিয়ে গঠিত যা দেখতে অনেকটা পানিতে ভাসমান তেলের বিন্দু বা সাবানের ফেনার মতো।

৫) কলয়ডাল (colloidal) তত্ত্ব : বর্তমান ধারণা অনুযায়ী, প্রোটোপ্লাজম হলো মূলত একটি কলয়ডীয় পদার্থ। অর্থাৎ এটা জলীয় মাধ্যমে প্রোটিন, লিপিড ও অন্যান্য পদার্থের একটি অপদ্রব (emulsion) । কলয়ডের মধ্যে অর্ধ কঠিন ও তরল অবস্থা দেখা যায়। এ অর্ধ কঠিন অবস্থার নাম জেল দশা (gel phase) এবং তরল অবস্থার নাম সল দশা (sol phase)। এ জেল দশা ও সল দশা একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এ মতবাদকে সল-জেল মতবাদও বলা হয়ে থাকে।

রাসায়নিক গঠন: প্রোটোপ্লাজম প্রধানত বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থের মিশ্রণ। এর রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ সমূহ নিম্নরূপ:

জৈব উপাদান : প্রোটিন (৭-১০%), কার্বোহাইড্রেট (১-৫%), লিপিড (১-২%) এবং অন্যান্য (১-৫%)।

অজৈব উপাদান : পানি (৬৫-৮৫%), অন্যান্য (১-৫%), অজৈব খনিজ লবণের মধ্যে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি ধাতু এবং কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি অধাতু থাকে।

কাজ : প্রোটোপ্লাজম কোষের সব সজীব ও জড় বস্তুকে ধারণ করে। প্রোটোপ্লাজমে বিদ্যমান প্রোটিন জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়। প্রোটোপ্লাজমে বৃদ্ধি, জনন, শ্বসন, খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক প্রভৃতি জৈবিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। এর প্রধান কাজ হলো বংশবিস্তার করা যা জীবনের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। অধিক লবণযুক্ত মাধ্যমে কোষকে রাখলে কোষ থেকে পানি ত্যাগের ফলে প্রোটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হয়ে প্লাজমোলাইসিস অবস্থা সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
প্রোটোপ্লাজমের গঠন কেমন?	প্রোটোপ্লাজমের কাজগুলো কী কী?

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) : প্লাজমা মেমব্রেন এর অভ্যন্তরে অবস্থিত ও নিউক্লিয়াস ব্যতীত অর্ধস্বচ্ছ, প্রোটোপ্লাজমের অংশটির নাম সাইটোপ্লাজম। গঠন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাইটোপ্লাজম ও প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিউক্লিয়াস ব্যতীত সাইটোপ্লাজমের বাকী অংশের নামই সাইটোপ্লাজম। সজীব কোষের সাইটোপ্লাজম দুটি স্পষ্ট অবস্থা (Phase) নিয়ে গঠিত। যথা: ১) সাইটোসল (Cytosol), ২) কোষীয় অঙ্গাণু (Cell Organelles) ।

সাইটোসল (Cytosol) : কোষের প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা আবৃত এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে অবস্থিত অঙ্গাণুসমূহ ছাড়া সমস্ত অস্বচ্ছ, সমসত্ত্বা ও কোলয়েড জাতীয় অর্ধতরল সজীব প্রোটোপ্লাজমীয় পদার্থকে সাইটোসল বা হায়ালোপ্লাজম বলে। এতে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব অণু ভাসমান বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

জৈব অণু সমূহ হলো : প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম ইত্যাদি।

অজৈব অণু সমূহ হলো : পানি ৯০%, সামান্য পরিমাণ খনিজ লবণ যেমন-NaCl লবণ এবং গ্যাসীয় পদার্থ যেমন-O_2 ও CO_2 ইত্যাদি। এছাড়া কিছু সঞ্চিত খাদ্যকণা এবং তেলবিন্দুও সাইটোসলে থাকে।

সাইটোসলকে ঘনত্ব অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **এক্টোপ্লাজম (Ectoplasm) :** এটা দানাহীন, স্বচ্ছ এবং অনড় স্তর, যা প্লাজমা মেমব্রেন সংলগ্ন থাকে এবং এন্ডোপ্লাজমকে ধারণ করে।

২. এন্ডোপ্লাজম (Endoplasm) : এক্টোপ্লাজমের ভিতরের দিকে অবস্থিত দানাদার অস্বচ্ছ অংশটিকে এন্ডোপ্লাজম বলে। এটি বিভিন্ন ধরনের কোষীয় অঙ্গাণু ধারণ করে।

সাইটোপ্লাজম এবং এর মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রকার সজীব ও নির্জীব বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে সাইটোপ্লাজমকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ১। সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা ২। সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুসমূহ।

১। সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা বা ধাত্র (Matrix) বা হায়ালোপ্লাজম : সাইটোপ্লাজমের অর্ধতরল, অর্ধস্বচ্ছ, দানাদার ও সমধর্মী কলয়ডীয় পদার্থটির নামে সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র বা হায়ালোপ্লাজম। হায়ালোপ্লাজম দুটি অঞ্চলে বিভেদিত। যথা– এক্টোপ্লাজম বা বহিঃপ্লাজম এবং এন্ডোপ্লাজম বা অন্তঃপ্লাজম। প্লাজমা মেমব্রেন সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত কম দানাদার, ঘন অঞ্চলটির নাম এক্টোপ্লাজম এবং ভেতরের দিকের অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে কম ঘন অঞ্চলটির নাম এন্ডোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থ, অ্যাসিড ও এনজাইম বিদ্যমান। কোষের বিভিন্নতা অনুসারে সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র তন্তুময়, দানাদার, জালিকাকার অথবা ফেনার মত হতে পারে।

সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকার কাজ ঃ কোষের বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু ও নির্জীব পদার্থগুলোকে ধারণ করে। বিপাকীয় কার্যাদি পরিচালনা করে। রেচন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে। কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। আবর্তনের মাধ্যমে অঙ্গাণুগুলোকে নড়াচড়ায় সহায়তা করে। উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

২। কোষীয় অঙ্গাণু (Cell Organelles) : কোষের প্রোটোপ্লাজমে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট আকার আকৃতি ও কাজ বিশিষ্ট সজীব বস্তুকে কোষীয় অঙ্গাণু বা (Cell Organelles) বলে। প্রাণিকোষে দু'ধরনের কোষীয় অঙ্গাণু দেখা যায়-

ক) **আবরণীবদ্ধ কোষীয় অঙ্গাণু :** এ ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুগুলো সুনির্দিষ্ট আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন- ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, গলগি বডি, লাইসোসোম, ভ্যাকুওল, পারঅক্সিসোম, ভেসিক্‌ল।

খ) **আবরণীবিহীন কোষীয় অঙ্গাণু :** এ ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুগুলো কোনো আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে না। যেমন- রাইবোসোম, প্রোটিয়োসোম, সেন্ট্রিওল, মাইক্রোফিলামেন্ট, ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট, মাইক্রোটিউবিউলস।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
সাইটোপ্লাজম কী?	কোষীয় অঙ্গাণুগুলি কয় ধরনের লিখ।

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: কোষীয় অঙ্গাণুর প্রকারভেদের একটি চার্ট তৈরি করে আন।

রাইবোসোম (Ribosome)

সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় বিরাজমান অথবা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে অবস্থিত যে দানাদার কণায় প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে তাকে রাইবোসোম। বিজ্ঞানী ক্লড (Claude) ১৯৪০ সালে এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। পরে Palade (১৯৫৫) প্রাণীকোষে এর ইলেকট্রনিক আণুবীক্ষণিক গঠন পর্যবেক্ষণ করেন। রাইবোসোম অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং প্রায় গোলাকার। সাধারণত অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উভয় দিকে এরা সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে। সাইটোপ্লাজমে যুক্ত অবস্থায়ও রাইবোসোম থাকে। মুক্ত রাইবোসোম প্রাককেন্দ্রিক কোষের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সাইটোপ্লাজমে যুক্ত অবস্থায় বিরাজমান অথবা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে অবস্থিত যে দানাদার কণায় প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে তাকে রাইবোসোম। বিজ্ঞানী ক্লড (Claude) ১৯৪০ সালে এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। পরে Palade (১৯৫৫) প্রাণীকোষে এর ইলেকট্রনিক আণুবীক্ষণিক গঠন পর্যবেক্ষণ করেন।

রাইবোসোম অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং প্রায় গোলাকার। সাধারণত অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উভয় দিকে এরা সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে। সাইটোপ্লাজমে যুক্ত অবস্থায়ও রাইবোসোম থাকে। মুক্ত রাইবোসোম প্রাককেন্দ্রিক কোষের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
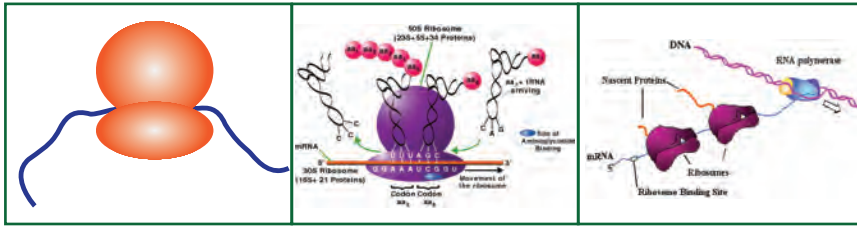
চিত্র : রাইবোসোম

আবিষ্কার ঃ ক্লড (A. Claude) নামক একজন বিজ্ঞানী ১৯৫৪ সালে যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমকে সেন্ট্রিফিউজ করে RNA সমৃদ্ধ ৬০০ A0 –২০০০ A0 ব্যাস বিশিষ্ট বহু কণা পৃথক করেন এবং নাম দেন মাইক্রোসোম। পরবর্তীতে (১৯৬৫) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মাইক্রোসোমের দু'টি অংশ দেখা যায়, একটি হল অন্তঃপ্লাজমীয় ঝিল্লী এবং অপরটি হল ক্ষুদ্রাকার কণা। এই কণাকেই পরবর্তীতে রাইবোসোম নাম দেয়া হয়। ১৯৫৮ সালে Roberts এর নাম দেন রাইবোসোম। ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয়োপ্লাজমে রাইবোনিউক্লিয়োকণা (Ribonucleo protein particle – RNP) নামক ক্ষুদ্রাকার রাইবোসোম আবিস্কৃত হয়েছে।

বিস্তৃতি ঃ যে সব কোষ প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে সেসব কোষে রাইবোসোম পাওয়া যায়। প্রোক্যারিওটিক কোষে সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। ইউক্যারিওটিক কোষে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, নিউক্লিয় ঝিল্লী ও কোষঝিল্লীর গায়ে যুক্ত থাকে এবং সাইটোপ্লাজমেও ছড়ানো থাকে। এছাড়াও নিউক্লিয়াস, প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়ার মাতৃকায়ও মুক্ত অবস্থায় থাকে। ব্যাকটেরীয় কোষে (*E. coli*) এর সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ কিন্তু কোনো কোনো ইউক্যারিওটিক কোষে এ সংখ্যা এক কোটি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রকারভেদ ঃ আকার ও সেডিমেন্টেশন সহগ (কো-এফিসিয়েন্ট) হিসেবে রাইবোসোম মূলত 70S এবং 80S দুই প্রকার। 70S রাইবোসোম 50S এবং 30S এই দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। 80S রাইবোসোম 60S এবং 40S এই দুই সাব–ইউনিটে বিভক্ত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় প্রাককেন্দ্রিক কোষে 50S ও 30S সাব-ইউনিট একত্রিত হয়ে 70S একক গঠন করে এবং সুকেন্দ্রিক কোষে 60S ও 40S সাব-ইউনিট একত্রিত হয়ে ৮০S একক গঠন করে। [কোন বস্তুকে সেন্ট্রিফিউজ করলে তলায় তার অধঃক্ষেপ জমা হয়

সেন্ট্রিফিউজ করা কালে বিভিন্ন ভারসম্পন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপণের হারকে S দিয়ে তা বুঝানো হয়। S = Svedberg unit = ভেদবার্গ একক ; সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের দ্রুত ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভরসম্পন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপণের হারকে ভেদবার্গ একক বলে। বিজ্ঞানী Svedberg এর নামের প্রথম অক্ষ S দিয়ে তা বোঝানো হয়ে থাকে।

আকৃতি ও গঠন ঃ এরা মূলত বৃত্তাকার তবে ত্রিকোণ এবং পঞ্চকোণ বিশিষ্ট বলেও অনেকে দাবি করেছেন। এটি চওড়ায় 22nm এবং উচ্চতায় 20nm। এরা দুস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লী দিয়ে আবৃত। রাইবোসোম প্রধান প্রোটিন ও rRNA দিয়ে তৈরি। *E.coli* কোষের শুষ্ক ওজনের প্রায় ২২ ভাগই রাইবোসোম। 70S রাইবোসোমে ৩৪ প্রকার দীর্ঘ ও ২১ প্রকার ক্ষুদ্র প্রোটিন থাকে। রাইবোসোমের বহু প্রোটিন মূলত এনজাইম। mRNA অণু রাইবোসোমের সাথে যুক্ত হলে tRNA-র সহায়তায় প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। সংশ্লেষের সময় একই সাথে পরস্পর বেশ কয়েকটি রাইবোসোম mRNA-এর সাথে যুক্ত হলে তখন তাকে পলিরাইবোসোম (polyribosome) বা পলিসোম বলে।।
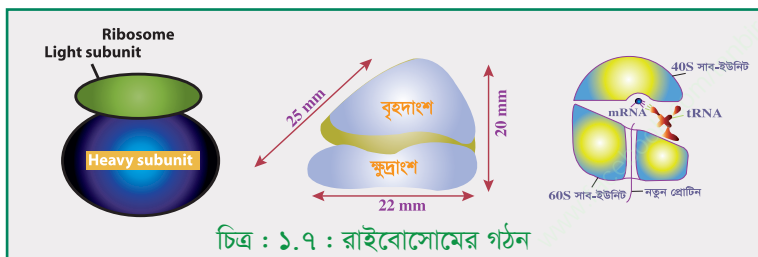
চিত্র : ১.৭ : রাইবোসোমের গঠন

রাসায়নিক উপাদান ঃ রাইবোসোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে RNA ও প্রোটিন। 70S রাইবোসোমে রয়েছে 23S, 16S ও 5S মানের ৩টি rRNA অণু এবং ৫২ প্রকারের প্রোটিন অণু। অপরদিকে 80S রাইবোসোমের রয়েছে 28S, 18S, 5.8S ও 5S মানের ৪টি rRNA অণু এবং ৮০ প্রকারের প্রোটিন অণু।

উৎপত্তি ঃ প্রাককেন্দ্রিক কোষে আদি ক্রোমোসোম (DNA) থেকে উৎপন্ন হয় কিন্তু সুকেন্দ্রিক কোষে নিউক্লিয়োলাসে উৎপন্ন হয়।

রাইবোসোমের কাজ ঃ প্রোটিন সংশ্লেষণ করা। প্রোটিন সংশ্লেষণের শুরুতে mRNA আদি কোষের 30S এবং প্রকৃত কোষের 40S সাব ইউনিটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এরপর 50S এবং 60S সাব-ইউনিটে একত্রিত হয়ে যথাক্রমে 70S (আদি কোষে) এবং 80S (প্রকৃত কোষে) একক গঠন করে। ২। স্নেহ বিপাকে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
রাইবোজোম এর গঠন কেমন?	রাইবোজোমের কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজঃ রাইবোজোম ও গলজিবস্তুর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে একটি পোস্টার তৈরি করে আনবে।

গলগি বস্তু (Golgi body)

নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থিত এবং দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ ছোট নালিকা, ফোস্কা, চৌবাচ্চা বা ল্যামেলীর ন্যায় সাইটোপ্লাজমিক ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম গলগি বস্তু (গলগি যন্ত্র)। বিজ্ঞানী ক্যামিলো গলগি (Camillo Golgi) ১৮৯৮ সালে প্রথম পেঁচা ও বিড়ালের স্নায়ুকোষে এটি দেখতে পান এবং তাঁর নামানুসারে পরবর্তীকালে এ ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম রাখা হয়েছে গলগি বস্তু। উদ্ভিদ কোষে এরা অল্প পরিমাণে অবস্থান করে।

চিত্র : ১.৮ : গলগি বডির গঠন
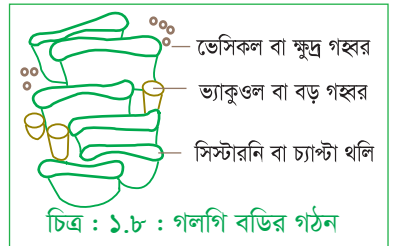
কোষের নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থিত এবং মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা থেকে সৃষ্ট যে অঙ্গাণু কতকগুলো ঘন সংলগ্ন চওড়া সিস্টারনি ও ক্ষুদ্র ভেসিকল বিশিষ্ট, সেগুলোকে একত্রে গলগি বডি বা গলগি অ্যাপারেটাস বা গলগি কমপ্লেক্স বলে। কোনো জীবন্ত শুক্রাণুকে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে সহজে গলগি বস্তু দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা বাদে সব কোষেই গলগি বস্তু থাকে।

আবিষ্কার : বিজ্ঞানী ক্যামিলো গলগি (Camillo Golgi, ১৮৯৮) সর্বপ্রথম পেঁচা ও বিড়ালের স্নায়ুকোষ নিরীক্ষণকালে এটি আবিষ্কার করেন। সম্ভবত মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে উৎপত্তি হয়।

অবস্থান : সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থাকলেও কোষের কিনারার দিকে বা কোষের যেকোনো জায়গায় গলগি বস্তু থাকতে পারে। কোষভেদে এদের অবস্থানের পরিবর্তন হয়। গলগি বডি প্রাণিকোষের একটি অনন্য সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু। কিন্তু উদ্ভিদ কোষে এদের সংখ্যা কম। অধিকাংশ ইউক্যারিওটিক কোষে সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি দলবদ্ধ অবস্থায় গলগি বডি দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে গলগি বস্তু সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

বিস্তৃতি : প্রোক্যারিওটিক কোষে এবং কিছু ছত্রাক, ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইটের শুক্রাণু, পরিণত সীভনল এবং প্রাণীর লোহিত কণিকায় গলজি বস্তু অনুপস্থিত। উদ্ভিদেকোষের সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে, কিন্তু প্রাণিকোষে এগুলো সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি স্তরীভূত অবস্থায় থাকে বা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে, কখনও বা জালিকার মতো বিন্যস্ত থাকে। উদ্ভিদকোষে গলজি বস্তুর সংখ্যা ১ (কিছু শৈবাল) থেকে ২৫,০০০ এর বেশি (শৈবালের রাইজয়েডে) হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজঃ গলগি বস্তু কী? কে আবিষ্কার করেন?

গঠন ঃ কোষের শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিত্তিতে গলগি বডির গঠনে ভিন্নতা দেখা যায়। ডালটন (Dalton) ফেলিক্স (Felix) প্রভৃতি বিজ্ঞানীর বর্ণনা মতে গলগি বডিতে তিনটি উপাদান বিদ্যমান। যথা- সিস্টারনি বা চ্যাপ্টা থলি, ভ্যাকুওল বা বড় গহ্বর ও ভেসিক্‌ল বা ক্ষুদ্র গহ্বর ।

(i) সিস্টারনি (Cisternae) ঃ অসমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ও সমান্তরালভাবে অবস্থিত লম্বা ও চ্যাপ্টা নালিকাসদৃশ বস্তুগুলো সিস্টারনি নামে পরিচিত। সম্ভবত মসৃণ অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা থেকে সিস্টারনি জন্ম হয়। এদের সংখ্যা ৩–২০টি।

(ii) ভ্যাকুওল (Vacuoles) ঃ এগুলো সিস্টারনির কাছে অবস্থিত গোলাকৃতির থলির মত অংশ। সিস্টারনির প্রাচীর চওড়া হয়ে ভ্যাকুওলের সৃষ্টি করে।

(iii) ভেসিক্‌ল (Vesicles) ঃ সিস্টারনির নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির মত বস্তুগুলোকে ক্ষুদ্র গহ্বর বা ভেসিক্‌ল বলা হয়। এগুলো সিস্টারনি থেকে সৃষ্টি হয়। এরা পৃথক বা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে এবং মসৃণ বা অমসৃণ আবরণী বিশিষ্ট হতে পারে।

রাসায়নিক গঠন ঃ গলগি বডির ঝিল্লী লিপোপ্রোটিনে নির্মিত। লিপিডের মধ্যে রয়েছে প্রধানত লেসিথিন ও সেফালিন জাতীয় ফসফোলিপিড। ক্যারোটিনয়েড, ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন-সি প্রভৃতিও রয়েছে। গলগি বডিতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম থার্কে। গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমগুলো হচ্ছে ADPase, Mg2+, ATPase, CTPase, TTPase, Galactosyl Transferase ও সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ ৬-ফসফেট।

গলগি বস্তুর কাজ : লাইসোসোম তৈরি করা A-প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ করা, কিছু এনজাইম নির্গত করা, প্রোটিন, হেমিসেলুলোজ, মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করা, কোষস্থ পানি বের করা, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি ঝিল্লীবদ্ধ করা, বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণ ও পরিবহনে অংশগ্রহন করা। কোষ বিভাজনের পর cell plate তৈরিতে সাহায্য করে। লিপিড ও প্রোটিনের সঞ্চয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
গলজিবস্তুর গঠন কেমন?	গলজিবস্তুর কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজঃ গলজিবস্তুর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে একটি পোস্টার তৈরি করে আনো।

লাইসোসোম (Lysosome)

লাইসোসোম (Lysosome) : Lyso = হজমকারী, somo = বস্তু হিসেবে ইউক্যারিওটিক কোষে যে থলি আকৃতির ও ঝিল্লীবেষ্টিত অঙ্গাণু অন্তঃকোষীয় পরিপাকের মুখ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে লাইসোসোম বলে।

চিত্র : লাইসোসোম

সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত যে অঙ্গাণু হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার হিসেবে কাজ করে তাকে লাইসোসোম বলে (Lyso = হজমকারী, somo = বস্তু)। বহুসংখ্যক নানাবিধ হাইড্রোলাইটিক এনজাইম একটি ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি লাইসোসোম তৈরি করে। ১৯৫৫ সালে দ্য দু'বে (de Duve) এ ধরণের ক্ষুদ্রাঙ্গের নামকরণ করেন লাইসোসোম।

আবিষ্কার : ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান ডি ডুভে (Christian de Duve) সর্বপ্রথম ইঁদুরের যকৃত কোষে এ বস্তু আবিষ্কার করেন এবং নামকরণ করেন লাইসোসোম।

উৎপত্তি : সম্ভবত গলগি বস্তু বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে এদের উৎপত্তি।

বিস্তৃতি : উদ্ভিদকোষে সাধারণত এদের দেখা যায় না ; তবে পেঁয়াজের বীজকোষে, ভুট্টা ও তামাকের চারাকোষ, ঈষ্টকোষে লাইসোসোম পাওয়া যায়। প্রাণিদেহের যকৃতকোষ, স্নায়ুকোষ, বৃক্ককোষ, অন্ত্রের আবরণীকোষ, অস্থি, জরায়ু, মূত্রথলি, মনোসাইট ও লিম্ফোসাইটে লাইসোসোম বেশি থাকে। বিভিন্ন কোষে এদের সংখ্যা ও আয়তন বিভিন্ন হয়। স্তন্যপায়ীর লোহিতকণিকা ছাড়া আর সব প্রকার প্রাণিকোষেই লাইসোসোম থাকে। তবে যেসব কোষ পরিপাক যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে, যেমন- শ্বেতকণিকা, অথবা ক্ষরণ করে, যেমন- যকৃত, অগ্ন্যাশয়, ইত্যাদি কোষে প্রচুর সংখ্যক লাইসোসোম থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে লাইসোসোমের অবস্থান

লাইসোসোমের গঠন

চিত্র : ১.৯ : লাইসোসোমের গঠন

ভৌত গঠন : লাইসোসোম প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রাকার গোল থলি। এর আকার পরিবর্তনশীল। কোনো কোনো লাইসোসোমের অভ্যন্তরভাগ ঘন, কোনোটির পার্শ্বদেশ ঘন ও মধ্যদেশ অপেক্ষাকৃত কম ঘন। কখনও আবার এর অভ্যন্তরে কিছু দানাদার পদার্থ কিংবা ক্ষুদ্র গহ্বরও দেখা যায়। এদের গড় ব্যাস ০.২৫−০.৮০ μm।

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : লাইসোসোম লিপোপ্রোটিন নির্মিত ঝিল্লীতে বেষ্টিত একগুচ্ছ এনজাইম বিশেষ। এতে রয়েছে অ্যাসিড ফসফাটেজ নামক টিশ্যু বিগলনকারী এনজাইম। অন্যান্য এনজাইমের মধ্যে রয়েছে অ্যারাইন সালফাটেজ, অ্যাসিড লাইপেজ, DNAase, RNAase, ফসফোলাইপেজ, এস্টারেজ, ডেক্সট্রোনেজ, স্যাকারেজ ও লাইসোজাইমসহ প্রায় ৫০ ধরনের এনজাইম। একেকটি লাইসোসোম একে ধরনের এনজাইমে সমৃদ্ধ।

প্রকারভেদ : বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে লাইসোসোম দেখা যায়। গঠন অনুসারে এরা প্রধানতঃ চার প্রকারের হয়। যথা: প্রাথমিক লাইসোসোম (Primary Lysosome), গৌণ লাইসোসোম (Secondary Lysosome), রেসিডুয়াল বডি (Residual Bodies) এবং অটোফ্যাগিক ভ্যাকুওল (Autophagic Vacuole)।

লাইসোসোমের কাজ ঃ ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বা আক্রমণকারী জীবাণু ভক্ষণ করা এদের কাজ। বিগলনকারী এনজাইমসমূহকে আবদ্ধ করে রেখে এটি কোষের অন্যান্য ক্ষুদ্রাঙ্গকে রক্ষা করে। লাইসোসোম সম্ভবত পরিপাক কাজে সাহায্য করে। তীব্র খাদ্যাভাবের সময় এর প্রাচীর ফেটে যায় এবং আবদ্ধকৃত এনজাইম বের হয়ে কোষের অন্যান্য ক্ষুদ্রাঙ্গগুলো বিনষ্ট করে দেয়। এ কাজকে বলে স্ব-গ্রাস বা অটোফেগী। (autophagy) এভাবে সমস্ত কোষটিও পরিপাক হয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় অটোলাইসিস (autolysis)।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
লাইসোসোমের গঠন কেমন?	লাইসোসোমের কাজগুলো কী কী?

সেন্ট্রিওল (Centriole)

সেন্ট্রিওল (Centriole) : উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষে যে অঙ্গাণু স্বপ্রজননক্ষম,নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত এবং একটি গহ্বরকে ঘিরে ৯টি গুচ্ছ প্রান্তীয় মাইক্রোটিউবিউল নির্মিত, খাটো নলে গঠিত তাকে সেন্ট্রিওল বলে। বিজ্ঞানী Van Benden এটি আবিষ্কার করেন।

বিস্তৃতি : শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট, জিমনোস্পার্ম প্রভৃতি উদ্ভিদে এবং অধিকাংশ প্রাণীতে সেন্ট্রিওল পাওয়া যায়। প্রোক্যারিওটিক কোষ, ডায়াটম, ঈস্ট ও অ্যানজিওস্পার্মে এটি অনুপস্থিত। সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি এটি অবস্থান করে। সংখ্যায় একজোড়া ।

ভৌত গঠন : সেন্ট্রিওল নলাকার, প্রায় ০.২৫ μm ব্যাস সম্পন্ন ও ৩.৭ μm লম্বা। এরা দেখতে বেলনাকার, দুমুখ খোলা পিপার মতো। প্রত্যেক সেন্ট্রিওল প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা– ১। প্রাচীর বা সিলিন্ডার ওয়াল ২। ত্রয়ী অণুনালীকা ৩। যোজক বা লিংকার। সেন্ট্রিওল প্রাচীর ৯টি ত্রয়ী অণুনালীকা দ্বারা গঠিত।

চিত্র : ১.১০ : সেন্ট্রিওলের গঠন

প্রতিটি অণুনালীকা সমদূরত্বে অবস্থিত এবং প্রত্যেকে ৩টি করে উপনালীকা নিয়ে গঠিত। পরস্পর সংলগ্ন ৩টি উপনালীকাকে যথাক্রমে A, B, C নামে চিহ্নিত করা হয়। উপনালীকাগুলো পাশ্ববর্তী অণুনালীকার সঙ্গে একধরনের ঘন তন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে। সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার বলে। সেন্ট্রোস্ফিয়ারসহ সেন্ট্রিওলকে সেন্ট্রোসোম বলে।

রাসায়নিক উপাদান : সেন্ট্রিওল প্রধানত প্রোটিন, লিপিড ও ATP নিয়ে গঠিত ।

কাজ : কোষ বিভাজনকালে মাকুতন্তু গঠন করে এবং ক্রোমোসোমের প্রান্তীয় গমনে সহায়তা করে। ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়াযুক্ত কোষে ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়ার সৃষ্টি করা।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
সেন্ট্রিওল কী? এর গঠন কেমন?	সেন্ট্রিওলের কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: লাইসোজোম ও সেন্ট্রিওলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে আনো।

এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা (Endoplasmic reticulum)

এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা (Endoplasmic reticulum) : কোষের সাইটোপ্লাজমে বিস্তৃত ও একক ঝিল্লীবিশিষ্ট জালিকার থলি, গহ্বর ও নালিকা সদৃশ অঙ্গাণু যা একাধারে কোষঝিল্লী ও নিউক্লিয় ঝিল্লীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে এবং সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলো অনিয়ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে অবস্থান করে, তাকে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বলে। বিজ্ঞানী Porter (১৯৪৫) সর্বপ্রথম কোষে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।
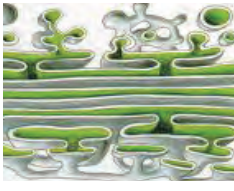
চিত্র : এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা

চিত্র : ১.১১ : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

আবিষ্কার : ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কে, আর. পোর্টার (K.R. Portyer) ও তাঁর সহকর্মীগণ সর্বপ্রথম যকৃত কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবিষ্কার করেন।

বিস্তৃতি : প্রোক্যারিওটিক কোষ, লোহিত রক্তকণিকা, ভ্রূণীয় কোষ ও ডিম্বাণু এবং অন্যান্য সকল ইউক্যারিওটিক কোষে এ অঙ্গাণু বিস্তৃত। যে সব অঙ্গের কোষে প্রোটিন সংশ্লেষ বেশি হয় সে সব কোষে (যেমন–অগ্ন্যাশয়, যকৃত, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি) এগুলো বেশি পাওয়া যায়।

প্রকারভেদ : রাইবোসোমের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুরকম, যথা-(i) মসৃণ ও (ii) অমসৃণ।

(ক) মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম : রাইবোসোমবিহীন জালিকাকে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে।

(খ) অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম : এ সব এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে রাইবোসোম বিন্যস্ত থাকে। অমসৃণ জালিকাতে RNA এবং গ্লাইঅক্সিসোম নামক ক্ষুদ্রাকার কণা থাকতে পারে। অমসৃণ রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশকে মাইক্রোসোম (microsome) বলে। গঠনশৈলীর ভিত্তিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামকে নিম্নবর্ণিত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) সিস্টারনি : দুপাশে চাপা, লম্বা, শাখাবিহীন ও সাইটোপ্লাজমে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলোকে সিস্টারনি বলা হয়। এদের ব্যাস সাধারণত ৪০ থেকে ৫০ মিলিমাইক্রন। এগুলোর গায়ে অনেক সময় রাইবোসোম যুক্ত থাকে।

(ii) ভেসিকল বা ফোস্কা : সাইটোপ্লাজমের ভেতরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ২৫ থেকে ৫০ মিলিমাইক্রন ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকৃতির বা ডিম্বাকৃতি জালিকাগুলো ভেসিকুলার বা ফোস্কাকার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নামে পরিচিত।

(iii) টিউবিউল বা নালিকাকার : শাখা-প্রশাখাযুক্ত ও মোটামুটিভাবে ৩০ থেকে ১০০ মিলিমাইক্রন ব্যাস বিশিষ্ট জালিকাগুলোকে টিউবিউলার বা নালিকাকার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলা হয়। এদের গায়ে সাধারণত রাইবোসোম যুক্ত থাকে।

ভৌত গঠন ঃ অঙ্গ সংস্থানিকভাবে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা তিন ধরনের গড়ন নিয়ে গঠিত ঃ (ক) সিস্টারনি, (খ) ভেসিকল ও (গ) টিউবিউল।

রাসায়নিক উপাদান ঃ এটি লিপোপ্রোটিন নির্মিত ত্রিস্তরী ঝিল্লীযুক্ত। জালিকায় বিভিন্ন ধরনের এনজাইম রয়েছে, যেমন–এস্টারেজ, NADH সাইটোক্রোম রিডাকটেক, NADH ডায়াফোরেজ, গ্লিসারাইড সংশ্লেষণকারী এনজাইম প্রভৃতি।

এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজ ঃ এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে। অমসৃণ রেটিকুলামে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। মসৃণ রেটিকুলামে (বিশেষত প্রাণী কোষে) লিপিড, মতান্তরে বিভিন্ন হরমোন, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয়। এটি লিপিড ও প্রোটিনের অন্তঃবাহক হিসেবে কাজ করে। অনেকের মতে এতে কোষপ্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি হয়। রাইবোসোম, গ্লাইঅক্সিসোমের ধারক হিসেবে কাজ করে। লিপিড এর বিপাক ঘটায়। থলির ভেতর সংশ্লেষিত প্রোটিনের প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে। কোষ বিভাজনের পর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তৈরিতে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা কী কী নিয়ে গঠিত?	এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে আনো।

মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) : প্রকৃত জীবকোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু হল মাইটোকন্ড্রিয়া। কোষের যাবতীয় জৈবনিক কাজের শক্তি সরবরাহ করে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের "পাওয়ার হাউস" বলা হয়। এ ক্ষুদ্রাঙ্গে ক্রেবস চক্র, ফ্যাটি অ্যাসিড চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া প্রভৃতি ঘটে থাকে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণী দ্বারা গঠিত সাইটোপ্লাজমস্থ যে অঙ্গাণুতে ক্রেবস চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ঘটে থাকে এবং শক্তি উৎপন্ন হয় সেই অঙ্গাণুকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে।
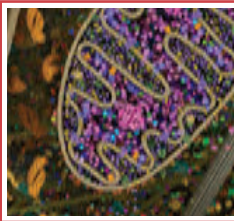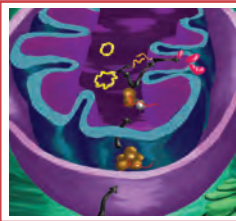
চিত্র ঃ মাইটোকন্ড্রিয়া

আবিষ্কার ও নামকরণ : কলিকার (Kolliker) ১৮৫০ সালে আলোক অণুবীক্ষণের সাহায্যে সাইটোপ্লাজমে নানা আকৃতি বিশিষ্ট এসব ক্ষুদ্রাঙ্গ আবিষ্কার করেন এবং ১৮৯৮ সালে বেন্ডা (Benda) এ ক্ষুদ্রাঙ্গগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন। [গ্রীক – mitos = thread; chondon = grain ; একবচন- মাইটোকন্ড্রিয়ন।]

উৎপত্তি : বিভাজনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোষে একটি মাত্র মাইটোকন্ড্রিয়ন (বহুবচনে- মাইটোকন্ড্রিয়া) থাকলে তা কোষ বিভাজনে সাথেই বিভাজিত হয়ে থাকে।

সংখ্যা : প্রকারভেদে প্রতি কোষে এক হতে একাধিক হতে পারে। সাধারণ গড়ে প্রতি কোষে ৩০০ হতে ৪০০টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। [যকৃত কোষে ১০০০ বা ততোধিক থাকে। *Amoeba*- তে আরও বেশি থাকে।]

আকৃতি : আকৃতিতে এরা বৃত্তাকার, দণ্ডাকার, তন্তুকার, তারকাকার ও কুণ্ডলী আকার হতে পারে।

আয়তন : বৃত্তাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার ব্যাস ০.২ – ২.০ মাইক্রন। দণ্ডাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৭০ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।
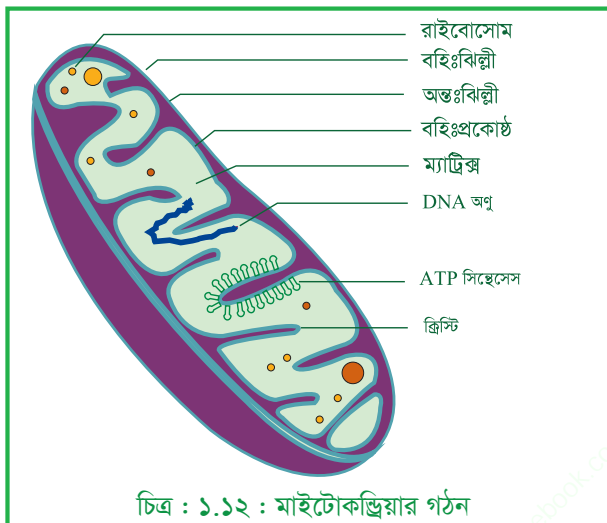
চিত্র : ১.১২ : মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন

শিক্ষার্থীর কাজ: মাইটোকন্ড্রিয়া কী? কে আবিষ্কার করেন?

গঠন :

১। আবরণী : মাইটোকন্ড্রিয়া একটি দ্বিস্তর আবরণী বিশিষ্ট ঝিল্লী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এদের বাইরের মেমব্রেন ও ভিতরের মেমব্রেন বলা হয়। মেমব্রেনটি লিপোপ্রোটিন বাইলেয়ার প্রকৃতির। বাইরের মেমব্রেনটি সোজা কিন্তু ভেতরের মেমব্রেনটি কেন্দ্রের দিকে অনেক ভাঁজ বিশিষ্ট। ভেতরের মেমব্রেনের ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টি বলা হয় ।

২। প্রকোষ্ঠ : দুই মেমব্রেনের মাঝখানের ফাঁকা স্থানকে বহিঃপ্রকোষ্ঠ বা বহিঃকক্ষ বলা হয় যা এক ধরনের তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। দুই মেমব্রেনের মাঝখানের ব্যবধান 6-8 nm। অন্তঃঝিল্লীতে বেষ্টিত ভেতরের গহ্বরকে বলা হয় অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। এর অভ্যন্তরে ম্যাট্রিক্স থাকে।

৩। ATP synthases ও ETS : ক্রিস্টিতে স্থানে স্থানে ATP synthases নামক গোলাকার বস্তু আছে। এতে ATP সংশ্লেষিত হয়। সমস্ত ক্রিস্টিব্যাপী অনেক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ETS অবস্থিত। আগে এদেরকে অক্সিজোম হিসাবে অভিহিত করা হত।

৪ । DNA ঃ মাইটোকন্ড্রিয়ায় এর নিজস্ব বৃত্তাকার দ্বি–সূত্র বিশিষ্ট DNA আছে ।

৫। রাইবোসোম ঃ মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে রাইবোসোম পাওয়া যায়। এটি 70S । এটি বিভিন্ন এনজাইম সংশ্লেষ করে। অন্যান্য উপাদান ঃ মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, কো এনজাইম, RNA ইত্যাদি থাকে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার রাসায়নিক উপাদান ঃ মাইটোকন্ড্রিয়ার শুষ্ক ওজনের প্রায় ৬৫% প্রোটিন, ২৯% গ্লিসারাইড সমূহ ৪% কোলেস্টেরল। লিপিডের মধ্যে ৯০% ফসফোলিপিড, বাকি ১০% ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যারোটিনয়েড, ভিটামিন E এবং কিছু অজৈব পদার্থ। মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লী লিপোপ্রোটিন সমৃদ্ধ। মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রায় ১০০ প্রকারের এনজাইম ও কো এনজাইম আছে। সম্প্রতি মাইটোকন্ড্রিয়ায় কিছু DNA, RNA ও রাইবোসোম পাওয়া গেছে । মাইটোকন্ড্রিয়ায় ম্যাট্রিক্সে বেশ কিছু ইলেকট্রোলাইট এর সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন- K^{+}, HPO, Mg^{++}, Cl^{-} , SO

মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ : কোষের যাবতীয় কাজের জন্য শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রন করা। শ্বসনের জন্য বিভিন্ন এনজাইম ও কো-এনজাইম মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে পাওয়া যায়। শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন-ক্রেবস চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ইত্যাদি মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়। মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তির নিয়ন্ত্রিত নির্গমন নিশ্চিত করে। কিছু পরিমাণ DNA ও RNA তৈরীতে অংশগ্রহন করে। মাইটোকন্ড্রিয়া স্নেহ বিপাকে সহায়তা করে। ADP কে ATP তে পরিণত করার মাধ্যমে উচ্চ শক্তি বন্ধনী সৃষ্টি করে নিজের দেহে সঞ্চয় করে রাখে। এভাবে কোষের যাবতীয় জৈবনিক কাজের শক্তি সরবরাহ করে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তির ঘর বলা হয় ।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন কেমন?	মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: মাইটোকন্ড্রিয়ার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে আনবে।

ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast)

সবুজ বর্ণের প্লাস্টিডকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোফিল–a, ক্লোরোফিল–b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিলের সমন্বয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত। এই অঙ্গাণুটি শুধুমাত্র উদ্ভিদকোষে বর্তমান। প্রাণী কোষে থাকে না।

প্রতি কোষে সংখ্যা ঃ এক হতে একাধিক। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদকোষে সাধারণত ১০ হতে ৪০টি ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদকোষে সাধারণত আরও কম থাকে।

চিত্র: ক্লোরোপ্লাস্ট

আকৃতি ঃ উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি সাধারণত লেন্সের মত হয়ে থাকে। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদকোষে এদের আকৃতি অনেক রকম হতে পারে, যেমন– সর্পিলাকার (Spirogyra), জালিকাকার (Oedogonium), তারকাকার (Zygnema), আংটি আকৃতির (Ulothrix), গোলাকার (Pithophora), পেয়ালাকৃতি (Chlamydomonas), ইত্যাদি।
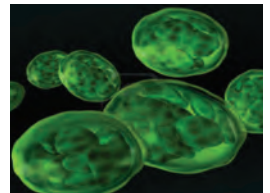
আকার ঃ লেন্স আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্টের ব্যাস সাধারণত ৩.৫ মাইক্রন। Spirogyra এর সর্পিলাকার ক্লোরোপ্লাস্ট সোজা অবস্থায় কোষের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি লম্বা।

উৎপত্তি ঃ নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি হয়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে আদি প্লাস্টিড হতে এদের উৎপত্তি হয়। আদি প্লাস্টিড ০.৫ মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার বস্তু।

প্রতিটি আদি প্লাস্টিডে ঘন স্ট্রোমা (ধাত্র পদার্থ) একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সৃষ্টির সাথে সাথে আদি প্লাস্টিড পূর্ণাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হতে থাকে। আদি প্লাস্টিডের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট আবরণীর ভেতরের স্তর হতে ফোস্কা (vesicles) বের হয়ে আসে এবং ধাত্র পদার্থে সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়। এ ফোস্কাগুলো মিলিত হয়ে একটি ল্যামেলী তৈরি করে। কিছু কিছু স্থানে ল্যামেলী গ্রানাম তৈরি করে। কিছু কিছু ল্যামেলী বিভিন্ন গ্রানার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এভাবে আদি প্লাস্টিড হতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ: ক্লোরোপ্লাস্ট কী?

ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন ঃ ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন বেশ জটিল। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় পর্যবেক্ষণ করলে ক্লোরোপ্লাস্টে সুস্পষ্ট ৬ টি অংশ দেখা যায় । যথা- (i) আবরণী বা পর্দা, (ii) স্ট্রোমা, (iii) থাইলাকয়েড ও গ্রানাম, (iv) স্ট্রোমা ল্যামেলী, (v) ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP –synthases, (vi) DNA ও (vii) রাইবোসোম।
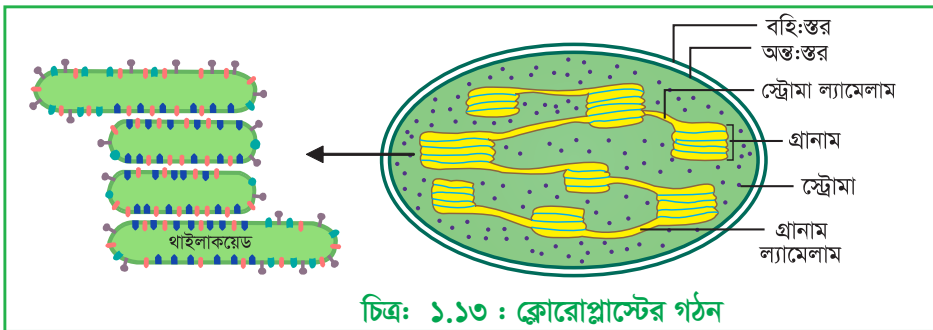
চিত্র: ১.১৩ : ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন

(i) আবরণী বা পর্দা ঃ প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্ট লিপোপ্রোটিন দিয়ে গঠিত একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট পর্দা দিয়ে আবৃত । এটি প্রায় 5 nm পুরু। গঠনের দিক দিয়ে এটি প্লাজমামেমব্রেনের অনুরূপ। পর্দাটি ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন বস্তুর যাতায়াত নিয়ন্ত্রন করে।

(ii) স্ট্রোমা ঃ পর্দা বেষ্টিত ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে অবস্থিত স্বচ্ছ, দানাদার, অসবুজ সমসত্ব জলীয় পদার্থের নাম স্ট্রোমা। এর মধ্যে রয়েছে লিপিড, শর্করা দানা, বিভিন্ন এনজাইম 70s রাইবোসোম, বিভিন্ন প্রোটিন, ভিটামিন, সাইটোক্রোম রঞ্জক, খনিজ আয়ন এবং DNA ও RNA। এখানে সালোকসংশ্লেষণের কেলভিন চক্র সম্পন্ন হয়।

(iii) থাইলাকয়েড ও গ্রানাম : স্ট্রোমাতে অসংখ্য থাইলাকয়েড নামক থলে আকৃতির বস্তু থাকে। কতকগুলো থাইলাকয়েড একসাথে একটির উপর একটি স্তূপের মত থাকে। থাইলাকয়েডের এই স্তূপকে গ্রানাম বলা হয়। গ্রানামের আকৃতি 0.3-1.7 µm। থাইলাকয়েড কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এর পৃষ্ঠদেশে প্রোটিন স্তরের নিচে আছে একটি ফসফোলিপিড স্তর। এর নিচে আছে সন্নিবিষ্ট একেকটি গোলাকার বস্তু। একে কোয়ান্টোজোম বলে। কোয়ান্টোজোম হচ্ছে সালোকসংশ্লেষণের একক এবং এর আকার হল এটি 18.5 nm লম্বা, 15.5 nm চওড়া। কোয়ান্টোজোম এর উচ্চতা 10 nm। প্রত্যেক কোয়ান্টোজোম এ থাকে ক্লোরোফিল -এ, ক্লোরোফিল -বি, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, ফসফোলিপিড,কুইনোন, সালফোলিপিড ও বিভিন্ন ধরনের এনজাইম।

(iv) স্ট্রোমা ল্যামেলী : দুটি পাশাপাশি গ্রানার কিছু সংখ্যক থাইলাকয়েডস সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্তকারী নালিকাকে স্ট্রোমা ল্যামেলী বলে। এদের অভ্যন্তরে ও ক্লোরোফিল বিদ্যমান থাকে।

(v) ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP -synthases : থাইলাকয়েড মেমব্রেন বহু গোলাকার বস্তু ATP-synthases বহন করে । এর মধ্যে সকল এনজাইম থাকে। মেমব্রেনগুলোতে অসংখ্য ফটোসিনথেটিক ইউনিট থাকে। প্রতি ইউনিটে থাকে ক্লোরোফিল- a, ক্লোরোফিল - b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল নামক পিগমেন্ট।

(vi) DNA : ক্লোরোপ্লাস্টে তার নিজস্ব DNA আছে। এখানে প্রায় ২০০টি DNA অণু থাকতে পারে। এদের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নিজের অনুরূপ সৃষ্টি ও কিছু প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী করে।

(vii) রাইবোসোম : ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবোসোমও থাকে। এরা ক্লোরোপ্লাস্টে প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষ করে থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্টের রাসায়নিক উপাদান ঃ কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন, ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড (ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল), DNA, RNA, রাইবোসোম, কিছু এনজাইম, কো -এনজাইম, এবং খনিজ অণু নিয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত স্টার্চ হল সাধারণ কার্বোহাইড্রেট, ক্লোরোপ্লাস্টের শুষ্ক ওজনের ২০-১০% লিপিড। কোলিন, ইনোসিটল, গ্লিসারল, ইথানল অ্যামাইন হল লিপিড অ্যালকোহল। প্রোটিনের মধ্যে ৮০% হল অদ্রবণীয় যা লিপিডের সঙ্গে একত্রে ঝিল্লী নির্মাণ করে এবং বাকি ২০% দ্রবণীয় এবং এনজাইমরূপে অবস্থান করে। ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে ক্লোরোফিল নামক সবুজ রঞ্জক পদার্থ। এর ৭৫% ক্লোরোফিল-a ২৫% ক্লোরোফিল -b। এছাড়া আছে সামান্য পরিমাণ ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।

ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ ঃ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP, NADP) পরিণত করে ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 ও H_2O সাহায্যে শর্করা তৈরী করে। সূর্যালোকের সাহায্যে ফসফোরাইলেশান প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। ফলে ADP + Pi থেকে ATP তৈরী করে। এনজাইম এর সহায়তায় আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য তৈরী করা ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতিধারায় এটি বংশগত জিন DNA অণুতে বহন করে। ক্লোরোপ্লাস্ট সালোকসংশ্লেষণের ক্যালভিন চক্রের প্রয়োজনীয় এনজাইম সংশ্লেষণ করে। বংশানুসারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তা ধারণ করে রাখে। ক্লোরোপ্লাস্টে ফটোরেস্পিরেশন ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্ট প্রয়োজনে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরী করে। ক্লোরোপ্লাস্টে এর নিজস্ব DNA আছে। এদের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নিজের অনুরূপ সৃষ্টি ও কিছু প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন কেমন?	ক্লোরোপ্লাস্টের কাজগুলো লিখ।

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজঃ ক্লোরোপ্লাস্টের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে একটি পোস্টার তৈরি করে আনবে।

নিউক্লিয়াস

নিউক্লিয়াস : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সবচেয়ে গাঢ়, অস্বচ্ছ ঝিল্লীবেষ্টিত গোলাকার অথবা উপবৃত্তাকার সজীব অংশটি যার অভ্যন্তরে ক্রোমাটিন আকারে DNA বহন করে তাকে নিউক্লিয়াস বলে।

নিউক্লিয়াস কোষের অপরিহার্য অংশ।

আবিষ্কার : ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) ১৮৩১ সালে রাস্নার (Vanda-এক প্রকার অর্কিড) পাতার কোষ পরীক্ষা করার সময় নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন।

চিত্র : ১.১৪ : নিউক্লিয়াসের গঠন

সংখ্যা ও বিস্তৃতি : প্রতি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। আদি কোষে কোন নিউক্লিয়াস থাকে না। কিছু সংখ্যক প্রকৃত কোষ যেমন-সিভ কোষ, মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা প্রভৃতিতে পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না।

আকৃতি : নিউক্লিয়াস সাধারণত বৃত্তাকার হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকার, ফিউজিফরম (মূলাকার), প্যাচানো থালার মতো এবং শাখান্বিতও হতে পারে।

অবস্থান : নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের মাঝখানে অবস্থিত থাকে; কোষ গহ্বর বড় হলে নিউক্লিয়াসটি কিনারার দিকে অবস্থান করে।

আকার ও আয়তন : আকার ও আয়তনে এটি ছোট বড় হতে পারে। গোলাকার নিউক্লিয়াসের ব্যাস সাধারণত এক মাইক্রন। সচরাচর এটি কোষের ১০–১৫% স্থান দখল করে থাকতে পারে। স্পার্ম বা শুক্রাণুর প্রায় ৯০% নিউক্লিয়াস।

শিক্ষার্থীর কাজ: নিউক্লিয়াস কী?

রাসায়নিক উপাদান : রাসায়নিকভাবে এটি মূলত নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এতে থাকে সাধারণ প্রোটিন, DNA এবং সামান্য RNA, কিছু পরিমাণ কো-এনজাইম ও অন্যান্য উপাদান।

ভৌত গঠন : নিম্নলিখিত চারটি অংশ নিয়ে একটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়– (i) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, (ii) নিউক্লিওপ্লাজম, (iii) নিউক্লিয়োলাস এবং (iv) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন জালিকা।

(i) **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন :** যে সজীব ও দ্বিস্তরবিশিষ্ট পর্দা দিয়ে প্রতিটি নিউক্লিয়াস আবৃত থাকে তাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লীয় ঝিল্লী বলে। বহিঃস্তরটি প্রায় 180 nm চওড়া ও অসংখ্য রন্ধ্রযুক্ত। প্রতি ঘন µm অংশে ৪০–৮০টি রন্ধ্র থাকে। রন্ধ্রের ব্যাস প্রায় 68nm। বহিঃস্তরের পৃষ্ঠদেশে প্রচুর রাইবোসোম লেগে থাকে বলে বেশ অমসৃণ। মাঝে-মধ্যে বহিঃস্তর এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার সঙ্গে যুক্ত থাকে। অন্তঃস্তর মসৃণ ও রন্ধ্রবিহীন। দুই স্তরের মধ্যবর্তী অংশটি ফাঁকা যা প্রায় 10nm চওড়া। ঝিল্লী লিপো-প্রোটিনে গঠিত। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এর অন্তঃস্তরটি ছিদ্রবিহীন কিন্তু বহিঃস্তরটি অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। এসব ছিদ্রের নাম নিউক্লিয়ার রন্ধ্র। প্রতিটি রন্ধ্রের অভ্যন্তরে আটটি বৃত্তাকার ছোট ছোট কণা অবস্থিত। এসব কণার উপস্থিতির কারণে রন্ধ্রগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভেতরের স্তরটি হতে অনেক সময় পিনোসাইটিক ফোস্কার মত ফোস্কা ছিদ্রপথে সাইটোপ্লাজমে বের হয়ে আসে।

কাজ : নিউক্লিয়াসকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোসোমকে সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক করে রাখে। সাইটোপ্লাজম এর সাথে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগ রক্ষা করে। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে নিউক্লিয়াসকে সংযুক্ত রাখে। নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়।
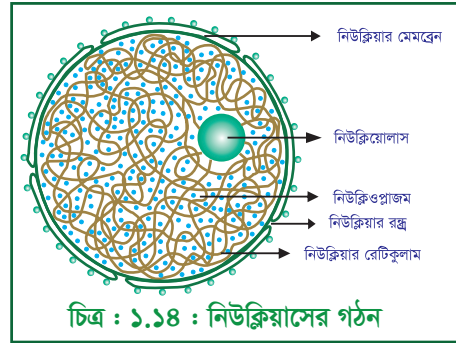
(ii) নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm) ঃ নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ, দানাদার ও জেলীর মত অর্ধতরল পদার্থটির নাম নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিম্ফ। নিউক্লিওপ্লাজম মূলত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও এতে RNA বিভিন্ন এনজাইম ও খনিজ লবণ থাকে।

কাজ ঃ নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোসোমের মাতৃকা বা ধারক হিসেবে কাজ করে। নিউক্লিয়াসের জৈবনিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। বিক্রিয়ার ও বংশগতি উপাদানের কর্মকাণ্ডের প্রধান মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

(iii) নিউক্লিওলাস (Nucleolus) ঃ নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুটি নিউক্লিওলাস নামে পরিচিত। বিজ্ঞানী ফন্টানা (Fontana) ১৭৮১ সালে সর্বপ্রথম এটি দেখতে পান। প্রাণিবিদ বাউম্যান (Bowman) ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে নিউক্লিওলাস নামকরণ করেন।

সংখ্যা ঃ প্রত্যেক প্রকৃত কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিওলাস থাকা অপরিহার্য। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ও প্রজাতিভেদে নিউক্লিওলাস এর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হতে পারে।

অবস্থান ঃ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট স্থানে নিউক্লিওলাস সংযুক্ত থাকে। নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির নাম SAT বা স্যাটেলাইট। নিউক্লিওলাস বহনকারী ক্রোমোসোমটিকে SAT ক্রোমোসোম বলা হয়।

উৎপত্তি ঃ SAT ক্রোমোসোমের স্যাটেলাইটে অবস্থিত জিন নিউক্লিয়োলাস উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভৌত গঠন ঃ এর কোন ঝিল্লী আবিস্কৃত হয়নি। নিউক্লিওলাসকে সাধারণত–(i) তন্তুময় (ii) দানাদার ও (iii) ম্যাট্রিক্স এই তিন অংশে ভাগ করা যায়।

রাসায়নিক গঠন ঃ নিউক্লিওলাসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান প্রোটিন, RNA এবং অল্প পরিমাণ DNA।

কাজ ঃ (i) নিউক্লিওলাস নিউক্লিক অ্যাসিড এর ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। (ii) নিউক্লিওলাস রাইবোসোম প্রস্তুত করে। (iii) প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে। (iv) বিভিন্ন প্রকার RNA সংশ্লেষণ করে।

(iv) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন জালিকা (Nuclear reticulum or Chromatin reticulum)ঃ কোষের বিশ্রাম অবস্থায় (A-বিভাজন অবস্থায়) নিউক্লিয়াসের ভেতরে জালিকার আকারে কিছু তন্তু দেখা যায়। তন্তুঘটিত এই জালিকাকে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বলে। এই জালিকাকে ক্রোমাটিন জালিকাও বলা হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনরত অবস্থায় বা পর্যায় মধ্যক অবস্থায় যে অংশ বা বস্তু ফুলজিন (Feulgen) রং নেয় সেই অংশ বা সেই বস্তুকে বলা হয় ক্রোমাটিন। কাজেই ক্রোমোসোমাল বস্তুই ক্রোমাটিন। কোষ বিভাজন অবস্থায় ক্রোমাটিন তন্তু ক্রমাগত কুণ্ডলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়ে পৃথক পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ও আকৃতিতে দৃশ্যমান হয় তখন এদেরকে ক্রোমোসোম বলা হয়। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসেই সাধারণত প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রতিটি ক্রোমোসোমে এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার, একটি ক্রোমোনেমা (বা একাধিক ক্রোমোনেমাটা) এবং কোন কোন ক্রোমোসোমে সেটেলাইট থাকে। ক্রোমোসোমে কতকগুলো জিন থাকে এবং জিনগুলোই প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন ঃ রাসায়নিকভাবে প্রতিটি ক্রোমোসোম DNA, RNA হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে গঠিত ; এ ছাড়া কিছু ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামও আছে। কতকগুলো নিউক্লিওটাইডের সমন্বয়ে একটি DNA অণু গঠিত।

কাজ : বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে। মিউটেশন, প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রজাতির বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

নিউক্লিয়াসের কাজ ঃ নিউক্লিয়াস কোষের সবধরনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এতে ক্রোমোসোম ও DNA থাকে যার দ্বারা বংশ পরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সাইটোপ্লাজম এর সাথে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগ রক্ষা করে। নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউক্লিওলাস নিউক্লিক অ্যাসিড এর ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। নিউক্লিওলাস রাইবোসোম প্রস্তত করে। নিউক্লিওলাস প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে। নিউক্লিওলাস বিভিন্ন প্রকার RNA সংশ্লেষণ করে। বিক্রিয়ার ও বংশগতি উপাদানের কর্মকাণ্ডের প্রধান মাধ্যম হিসাবে নিউক্লিওপ্লাজম কাজ করে। ক্রোমোসোম বংশগতি বৈশিষ্টের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে। ক্রোমোসোম মিউটেশন, প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্রোমোসোম প্রজাতির বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
নিউক্লিয়াসের গঠন কেমন?	নিউক্লিয়াসের কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজঃ নিউক্লিয়াসের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে আনবে।

ক্রোমোসোম (Chromosome)

ক্রোমোসোম (Chromosome) : কোষস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত, নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত, অনুলিপন ক্ষমতা সম্পন্ন যেসব সূত্রাকৃতির বংশগতীর উপাদান প্রজাতির পরিব্যক্তি, প্রকরণ ও বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাদের ক্রোমোসোম বলে। কোষ বিভাজনকালে নিউক্লিয়ার জালিকা থেকে ক্রোমোসোম সৃষ্টি হয়। ক্রোমোসোম নিউক্লিয়াসের অন্যতম বস্তু। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। আদি কোষে কোন সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকাতে তাতে কোন সুগঠিত ক্রোমোসোম থাকে না। তবে ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান DNA (কিছু ভাইরাসে RNA) বিদ্যমান থাকে। এদেরকে আদিক্রোমোসোম (prochromosome) বলা হয়। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বিভাজনরত কোষে ক্রোমোসোম দেখা যায়। এ জন্য সাধারণত বিশেষ রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

আবিষ্কার ঃ গ্রিক chroma অর্থ colour এবং soma অর্থ body বা দেহ। কাজেই ক্রোমোসোম অর্থ হল 'রঞ্জিত দেহ' বা 'রং ধারণকারী দেহ'। কারণ এরা কতকগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে Strasburger নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে Walter Flemming ক্রোমোসোম (splitting) বর্ণনা করেন এবং রং ধারণযোগ্য এ বস্তুকে নাম দেন ক্রোমোসোম। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে W. Waldeyer সর্বপ্রথম ক্রোমোসোম নামটি ব্যবহার করেন।

সংখ্যা ঃ প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে এর 2n সংখ্যা ২– ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। পুষ্পক উদ্ভিদে সর্বাধিক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। *Poa littarosa* $2n = 506 - 530$ সর্বাধিক সংখ্যক, এবং Haplopappus gracilis ($2n = 4$)-এ সর্বনিম্ন ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে।

ফার্ণ উদ্ভিদ *Ophioglossum reticulatum* (n = ৭৫০টি) নামক ফার্ণ উদ্ভিদে সর্বোচ্চ সংখ্যায় পাওয়া গেছে। প্রাণীতে সর্বনিম্ন $2n = 2$ (গোলকৃমি = *Ascaris megalocephala sub sp. univalens*) এবং সর্বাধিক $2n = 1600$ (*Olacantha sp.G*)। উচ্চতর জীবে সাধারণত প্রতি দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা ২ হতে ৫০-এর মধ্যে হয়।
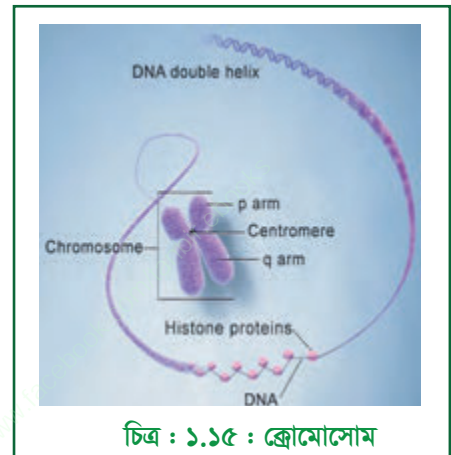
চিত্র : ১.১৫ : ক্রোমোসোম

আকার ঃ একটি ক্রোমোসোম সাধারণত ৩.৫ – ৩০μ দৈর্ঘ্য ও ০.২ – ২ μ প্রস্থ হয়ে থাকে। এর চেয়ে কম বা বেশিও হতে পারে অর্থাৎ ০.২ μ থেকে ৫০μ পর্যন্ত হতে পারে। কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির মাইটোটিক মেটাফেজ বা অ্যানাফেজ-এর নির্দিষ্ট কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোম আকার সর্বদাই একরকম থাকে। তাই এ পর্যায়েই সাধারণত ক্রোমোসোমের আকার-আকৃতি নির্ণয় করা হয়। উদ্ভিদ কোষের ক্রোমোসোম প্রাণীকোষের ক্রোমোসোমের তুলনায় আয়তনে বড় হতে পারে।

আকৃতি ও গঠন ঃ কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলো স্থূল, প্যাঁচানো ও দণ্ডাকার ক্রোমাটিড সূত্রে পরিণত হয়। তখন ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশ সুস্পষ্ট হয়। বৈশিষ্ট্যভেদে ক্রোমোসোম দু'প্রকার। যথা: (১) অটোজোম ও (২) সেক্স ক্রোমোসোম। যে ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে সেগুলো সেক্স ক্রোমোসোম এবং পুরুষ ও স্ত্রী x-ক্রোমোসোম ব্যতীত অন্য যেসব একই ধরনের ক্রোমোসোম থাকে সেগুলোর নাম অটোজোম।

একটি আদর্শ ক্রোমোসোমে নিম্নোক্ত অংশগুলো দেখা যায় ঃ

১। ক্রোমোনেমা বা ক্রোমোনেমাটা ঃ প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে একটি বা দুটি (কখনও অধিক) অণুসূত্র দ্বারা গঠিত। এই সূত্রকে একবচনে ক্রোমোনেমা (বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা) বলা হয়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, প্রতি ক্রোমোসোমে নূন্যতম দুটি এবং ঊর্ধ্বতম চারটি ক্রোমোনেমাটা থাকে। মেটাফেজ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে যে দুটি অংশে বিভক্ত হয় তার প্রতিটিকে ক্রোমাটিড (chromatid) বলা হয়।

২। সেন্ট্রোমিয়ার ঃ চারটি গোল ক্রোমাটিন দানা নিয়ে সেন্ট্রোমিয়ার গঠিত হয়। মাইটোটিক মেটাফেজ ও মায়োটিক মেটাফেজ–২ এ প্রতিটি রঞ্জিত ক্রোমোসোমে একটি অরঞ্জিত স্থান দেখা যায়। একে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোসোমকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, এক্রোসেন্ট্রিক ও টেলোসেন্ট্রিক।

৩। বাহু (Arm) ঃ সেন্ট্রোমিয়ারের পাশে ক্রোমোসোমের অংশকেই বাহু বলা হয়।

৪। ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) ঃ গুটিকাকার ক্রোমাটিন বস্তু যা ক্রোমোসোমে একসারিতে পরপর সাজানো থাকে, তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে। অবিচ্ছিন্ন DNA সূত্রের স্থানীয় প্যাঁচের ফলে মটরদানার মত এসব গুটির সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের লেপটোটিন ও জাইগোটিন দশায় ক্রোমোসোম যখন অপেক্ষাকৃত কম প্যাঁচযুক্ত থাকে তখন এগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কোন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে এদের সংখ্যা, অবস্থান ও আকৃতি নির্দিষ্ট।

চিত্র : ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন
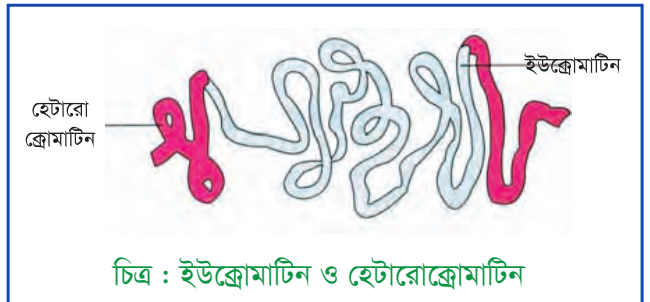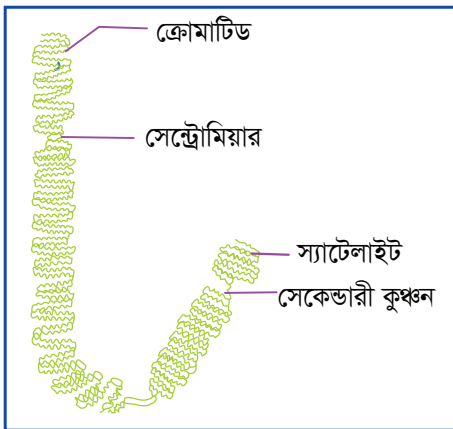
৫। সেকেন্ডারি কুঞ্চন (Secondary constriction) ঃ ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত অন্য কুঞ্চন থাকলে একে সেকেন্ডারি কুঞ্চন বলা হয়। SAT নামক সেকেন্ডারি কুঞ্চন নিউক্লিয়োলাস গঠনে সাহায্য করে থাকে। সম্ভবত এই সংকুচিত অঞ্চলেও DNA অণু অল্প কুণ্ডলিত থাকে।

৬। স্যাটেলাইট (Satellite) ঃ সেকেন্ডারি কুঞ্চন অঞ্চল ক্রোমোসোমের একপাশে থাকলে তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাহুকে স্যাটেলাইট বলে। এই অংশ মূল ক্রোমোসোম অংশের সাথে একটি ক্রোমাটিন সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে। স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোসোমকে স্যাট ক্রোমোসোম (Sat Chromosome) বলে।

৭। টেলোমিয়ার (Telomere) ঃ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এইচ.জে.মুলার (H.J. Muller) ক্রোমোসোমের প্রান্তদেশে টেলোমিয়ার নামক একটি বিন্দুর অবস্থান কল্পনা করেন। তিনি ধারণা করেন টেলোমিয়ারের অবস্থানের কারণেই কোন ক্রোমোসোমের দুটি প্রান্ত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না।

৮। ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন ঃ রঞ্জিত করার পর ক্রোমোসোমের যে অঞ্চল হাল্কা রং ধারণ করে তাকে ইউক্রোমাটিন অঞ্চল বলে। এ অঞ্চলেই বংশগতির বাহক জিনসমূহ অবস্থান করে। রঞ্জিত করার পর ক্রোমোসোমের যে অংশ গাঢ় রং ধারণ করে তাকে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল বলে।

সেন্ট্রোমিয়ার এর উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণীবিভাগঃ সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) ঃ প্রত্যেক ক্রোমোসোমের গোলাকার বর্ণহীন ও সংকুচিত একটি বিশেষ স্থানের নাম সেন্ট্রোমিয়ার। ক্রোমোসোমের এই অংশে spindle তন্তু যুক্ত থাকায় কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের সুনির্দিষ্ট চলন পরিলক্ষিত হয়। সেন্ট্রোমিয়ার এর উভয় দিকে বিস্তৃত অংশকে ক্রোমোসোমের বাহু বলা হয়। সেন্ট্রোমিয়ার এর অবস্থান অনুযায়ী আকৃতিগতভাবে ক্রোমোসোম চার প্রকারের হয়। যেমন−

(i) মেটাসেন্ট্রিক (Metacentric) : ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার মধ্যস্থানে অবস্থান করে ফলে ক্রোমোসোমের ২টি বাহু প্রায় সমান হয়। এক্ষেত্রে ক্রোমোসোমকে দেখতে অনেকটা V অক্ষরের মতো দেখায়।
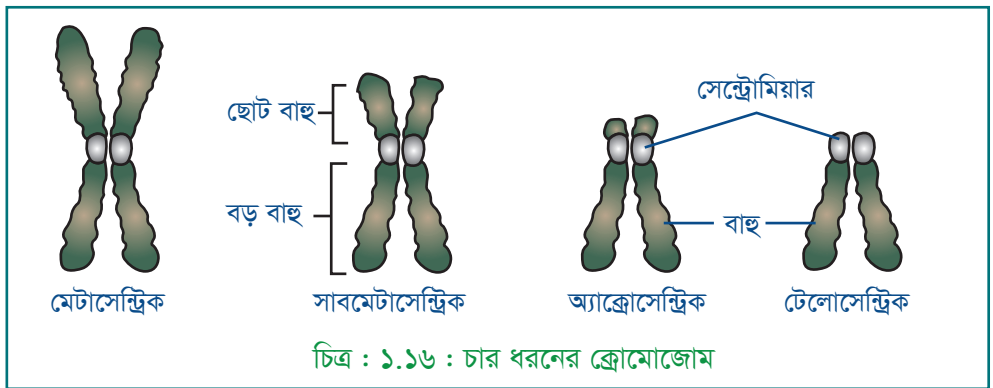
চিত্র : ১.১৬ : চার ধরনের ক্রোমোজোম

(ii) সাবমেটাসেন্ট্রিক (Sub-Metacentric) : ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার মধ্যস্থান থেকে একটু পাশে অবস্থান করায় ক্রোমোসোমের বাহু ২টি অসমান হয়। এই প্রকার ক্রোমোসোম দেখতে অনেকটা ইংরেজি L অক্ষরের মত।

(iii) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (Acrocentric) : যখন ক্রোমোসোমের কোন একটি প্রান্তের নিকট সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করে এবং ক্রোমোসোমের যে দুটি বাহু উৎপন্ন হয় তার একটি ছোট এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত বড় হয় এই জাতীয় ক্রোমোসোমকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। ইংরেজি 'J' অক্ষরের মতো হয়।

(iv) টেলোসেন্ট্রিক (Telocentric) : এই জাতীয় ক্রোমোসোমের এক প্রান্তে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। ফলে ক্রোমোসোমের একটি বাহু ছোট বিন্দুর ন্যায় হয় এবং অপরটি খুব বড় ও লম্বা হয়। ক্রোমোসোমের দণ্ডাকৃতির এবং ইংরেজী 'I' অক্ষরের মতো সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণত ক্রোমোসোমে ১টি করে সেন্ট্রোমিয়ার উপস্থিত থাকে। এই ধরনের ক্রোমোসোমকে ইউসেন্ট্রিক (Eucentric) ক্রোমোসোম বলে। এটি ক্রোমোসোমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আবার কোন কোন ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার অনুপস্থিত থাকতে পারে। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ক্রোমোসোমকে অ্যাসেন্ট্রিক (Acentric) বা সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ক্রোমোসোম বলে।

হোমোলোগাস ক্রোমোসোমদ্বয়ের মধ্যে প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সন এর ফলে এই ধরনের (Acentric) ক্রোমোসোমের উদ্ভব হয়। সেন্ট্রোমিয়ার এর সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোসোমকে (i) এক সেন্ট্রোমিয়ার (monocentric) (ii) দ্বি সেন্ট্রোমিয়ার (dicentric) (iii) বহু সেন্ট্রোমিয়ার (polycentric) ক্রোমোসোম বলে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সিস্টার বা নন-সিস্টার ক্রোমাটিডদ্বয়ের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে এই ধরনের ক্রোমোসোম দেখা যায়। পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমে দুই এর অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। উদাহরণ– Lurulla purpurea, কিছু শৈবাল, মস ও ছত্রাকে দেখা যায়। এছাড়া কোন কোন ক্রোমোসোমের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে সেন্ট্রোমিয়ার থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের ক্রোমোসোমকে Diffusecentric Chromosome বলে। এই ক্রোমোসোমে এতবেশি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে যে, তা নির্ণয় করা যায় না। Heteroptera order এর কিছু পতঙ্গে এইরূপ ক্রোমোসোম লক্ষ্য করা যায়।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন : ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এর প্রধান উপাদান- নিউক্লিক অ্যাসিড-DNA ও RNA। প্রোটিন : হিস্টোন প্রোটিন, নন-হিস্টোন প্রোটিন। অন্যান্য উপাদান যেমন - লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন, এনজাইম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ।

১. প্রোটিন ঃ ক্রোমোসোমের প্রোটিন নিউক্লিক এসিডের সাথে যুক্ত থেকে নিউক্লিও প্রোটিন গঠন করে। প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার যা জীবদেহের প্রধান গঠন উপাদান। এটি দুই ধরনের হয়। যথা- (i) ক্ষারকীয় প্রোটিন বা বেসিক প্রোটিন (ii) অম্লীয় প্রোটিন বা নন বেসিক প্রোটিন। ক্ষারকীয় প্রোটিন– একাধিক ক্ষারকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে যে প্রোটিন গঠিত হয় একে হিস্টোন প্রোটিন বলে। যেমন–Arginin Lysine, Histidine। অম্লীয় প্রোটিন–পুষ্টির জন্য এই ধরনের প্রোটিন একান্ত আবশ্যক। যেমন– টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান। সাধারণ অবস্থায় ক্রোমোসোমের ৯০% হল DNA ও ক্ষারকীয় প্রোটিন এবং ১০% RNA ও অম্লীয় প্রোটিন। DNA ও ক্ষারকীয় প্রোটিনের মধ্যে ৫০% DNA ও ৫০% হিস্টোন জাতীয় ক্ষারকীয় প্রোটিন। ক্রোমোসোম গঠনকারী প্রোটিনের মধ্যে ৬০% হিস্টোন যা DNA এর সাথে যুক্ত হয়ে ক্রোমাটিন সৃষ্টি করে আর বাকি প্রোটিনগুলো হলো নন-হিস্টোন প্রোটিন যা ৪০% থেকে ক্রোমোসোমের কাঠামো তৈরি করে। হিস্টোন প্রোটিন ও নন-হিস্টোন প্রোটিনের অনুপাত মোটামুটিভাবে ১ ঃ ১। অনেক ক্ষেত্রে DNA হিস্টোনের পরিবর্তে DNA- প্রোটামিন বিরাজ করে। প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমে ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxy- ribonucleic acid = DNA) হল স্থায়ী উপাদান। কিছু ভাইরাসে ক্রোমোসোমের স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA দেখা যায়। প্রকৃত ক্রোমোসোমে RNA স্থায়ী উপাদান নয়। হিস্টোন এবং প্রোটামিন ও সময় সময় পুনঃস্থাপন (replacement) হয়।

২. নিউক্লিক এসিড : ক্রোমোসোমের দুই ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে। যথা (i) DNA (ii) RNA

(i) DNA: DNA একেবারেই স্থায়ী পদার্থ। একটি ক্রোমোসোমের DNA অণুটি দীর্ঘ এবং অখণ্ড। প্রতিটি DNA অণু বাঁকানো সিঁড়ির ন্যায় দ্বি-সূত্রক। এতে থাকে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডিনিন, থাইমিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন। অ্যাডিনিন ও গুয়ানিনকে পিউরিন বেস (এরা দুই চক্র বিশিষ্ট) বলে এবং থাইমিন ও সাইটোসিনকে পাইরিমিডিন বেস (এরা এক চক্র বিশিষ্ট) বলে।

(ii) RNA : প্রতিটি RNA অণু সাধারণত একসূত্র বিশিষ্ট। এটি পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার যেমন– অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিন দ্বারা গঠিত।

উপরোক্ত পদার্থগুলো ছাড়াও ক্রোমোসোমে লিপিড, বিবিধ এনজাইম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে বিরাজ করে। কোষের সাধারণ অবস্থায় বা কোষ বিভাজন শেষে ইন্টারফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোমকে আর দেখা যায় না। তখন তা ক্রোমাটিন জালিকায় পরিবর্তিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ক্রোমাটিন জালিকা ও ক্রোমোসোম দুটি ভিন্ন নাম হলেও একই উপাদানের দুটি পর্যায়ের গাঠনিক অবস্থামাত্র।
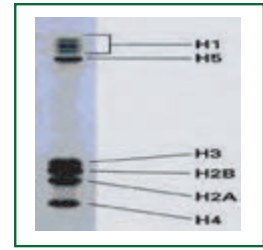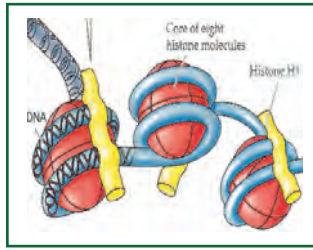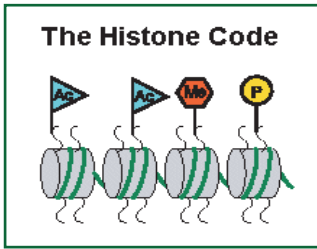
চিত্র : ১.১৭ : হিস্টোন প্রোটিন এর গঠন

ক্রোমোসোম নিউক্লিওপ্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে রয়েছে DNA ও RNA এবং প্রোটিনের মধ্যে হিস্টোন ও ননহিস্টোন, কিছু অম্লীয় প্রোটিন, DNA সমলিপন প্রোটিন, মেথিলেশন, অ্যাসিটিলেশন ও ফসফরাইলেশন প্রোটিন উপাদান।

ক্রোমোসোমে প্রায় ৩৫% DNA, ৩৫% হিস্টোন, ২০% ননহিস্টোন এবং ১০% RNA রয়েছে। হিস্টোন এক ধরনের ক্ষারীয় প্রোটিন। এখানে H_1, H_2A, H_2B, H_3 ও H_4-এ পাঁচ ধরনের স্বতন্ত্র হিস্টোন সংযুক্ত থাকে। এসব প্রোটিন বেশ ছোট যার মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা রয়েছে যথাক্রমে ২১৬, ১২৯, ১২৫, ১৩৫ ও ১০২টি। এছাড়া H_5-নামক হিস্টোন প্রোটিন ও সংযুক্ত থাকে ।

ক্রোমোসোমের সূক্ষ্মগঠন ঃ ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে ক্রোমাটিন সূত্রকে পুঁতির মালার মতো দেখায়। পুঁতির মতো এ দানাগুলোকে নিউক্লিওসোম (nucleosome) নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে নিউক্লিওসোমকে ক্রোমোসোমের গাঠনিক একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নিউক্লিওসোমগুলো পরস্পর যুক্ত থেকে ক্রোমাটিন জালিকাকে দৃশ্যমান করে তোলে। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে ক্রোমোসোমের সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনায় সচেষ্ট হয়েছেন। বর্তমানে সোলেনয়েড মডেল (solanoid model) বহুল গৃহীত ।এ মডেলের প্রবক্তা R. D. Kornberg ও J. O. Thomas (১৯৭৪)। সোলেনয়েড মডেল অনুযায়ী, ক্রোমাটিন তন্তু একসারিতে অসংখ্য নিউক্লিওসোমে সাজানো থাকে। এগুলো দেখতে গোল, চাপা চাকতির মতো (ব্যাস 11nm, উচ্চতা 5.5 nm)। চাকতির কেন্দ্রীয় অংশ H_2A, H_2B, H_3 ও H_4 -এ চার ধরনের হিস্টোন প্রোটিনে তৈরি। এসব প্রোটিনের প্রত্যেকটির দুটি করে অণু থাকে, অর্থাৎ মোট ৮টি হিস্টোন অণু মিলে দানাকৃতির একটি আট-হিস্টোন একক (octamer) গঠন করে। আট-হিস্টোন একককে ঘিরে থাকা DNA অণুসূত্রের অংশকে কোর (core) বা মূল অংশ বলে। কোর অংশের হিস্টোন প্রোটিনকে কোর প্রোটিন (core protein) এবং একে ঘিরে থাকা DNA অংশকে কোর DNA (core DNA) বলে।

চিত্র : ১.১৮ : ক্রোমোসোমের সূক্ষ্ম ভৌত গঠন

কোর DNA-র অংশের বাইরের বর্ধিত DNA অংশকে লিংকার DNA (linker DNA) বলে। এটি পরবর্তী নিউক্লিওসোমের লিংকার DNA-ও সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমশ লম্বা অণুসূত্র সৃষ্টি করে। এ লম্বা অণুসূত্রটি ক্রোমাটিন (Chromatin) নামে পরিচিত।

লিংকার DNA-র সঙ্গে কোর DNA অংশ ও কোর প্রোটিনের বাইরে H_1 নামে একটি হিস্টোন প্রোটিন সেঁটে থাকে। ফলে লিংকার DNA-সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং নিউক্লিওসোমের আকৃতি সুদৃঢ় হয়।

ক্রোমোসোমের কাজ ঃ ক্রোমোসোম বংশগতির ধারক ও বাহক, তাই বংশপরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, বহন করে এবং স্থানান্তর করে। বিভক্তির মাধ্যমে ক্রোমোসোম কোষ বিভাজনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। ক্রোমোসোমস্থ DNA প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ফলে নবীন ক্রোমাটিন বস্তু ক্রোমোসোম আকৃতি প্রাপ্ত হয়ে কোষ বিভাজনে প্রধান ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
ক্রোমোজোম কী? এর কাজ কী?	ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনে কী কী উপাদান থাকে?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: ক্রোমোজোমের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে আনবে।

কোষবিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা

কোষবিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা : বংশগতীয় কণাগুলো ক্রোমোসোমের মাধ্যমেই মাতা-পিতা হতে সন্তান স্থানান্তরিত হয়। ক্রোমোসোমের কাজ হল মাতা-পিতা হতে আগত কণা তথা জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে) সন্তানে-সন্ততিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া। ক্রোমোসোম হল বংশগতির ভৌত ভিত্তি (physical basis of heredity)। জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্য এক বা একাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জিনের মাধ্যমে ক্রোমোসোম জীবের যাবতীয় জৈবিক ও বংশগতির কার্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ কারণে ক্রোমোসোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। কোষ বিভাজনের মায়োটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশগতির এই ধারা অব্যাহত থাকে। ক্রোমোসোমের গঠনগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে জীবের প্রকরণ সৃষিট হয়। লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোসোম ভূমিকা পালন করে।
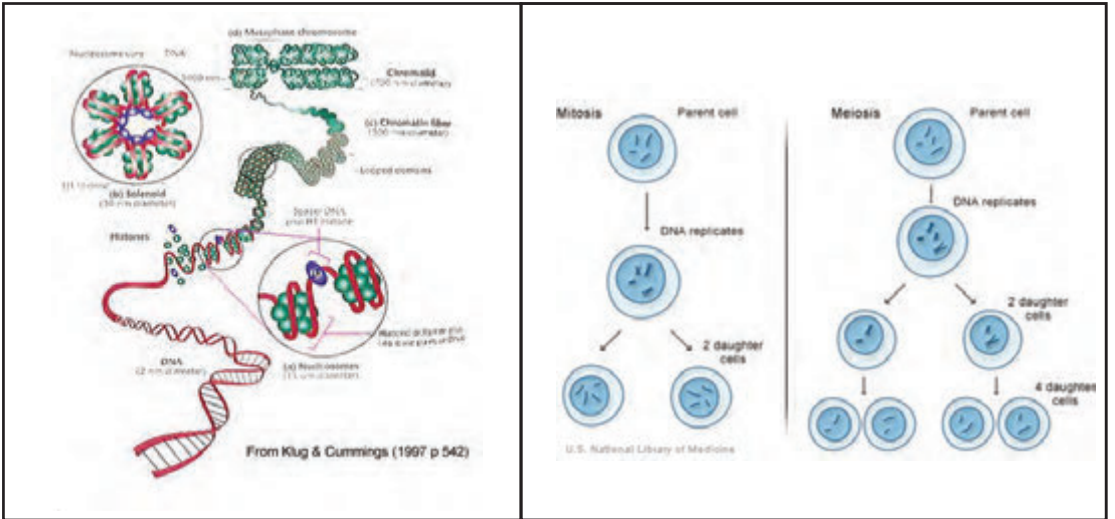
শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম কী ভূমিকা পালন করে।

বংশগতি বস্তু (Hereditary material)

বংশগতি বস্তু (Hereditary material) ঃ যার মাধ্যমে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয় এদেরকে একত্রে বংশগতি বস্তু (hereditary material) বলা হয়। বংশগতি বস্তুর প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোসোম। এ ক্রোমোসোমে রয়েছে DNA যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে। জিনই হচ্ছে জীবের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক যা পর্যায়ক্রমে বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)

জীবজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিপাকক্রিয়া ও বংশবৃদ্ধি। এসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিড হলো উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট একপ্রকার জৈব অ্যাসিড। জীবজগতের বৈশিষ্ট্য বহনকারী, প্রকাশকারী এবং বংশগতি উপাদান হিসেবে নিউক্লিক অ্যাসিড কাজ করে। অসংখ্য নিউক্লিওটাইড পলিমার তৈরির মাধ্যমে যে অ্যাসিড তৈরি হয় তাকে নিউক্লিক অ্যাসিড বলে। ১৮৬৯ সালে সুইস চিকিৎসক ও রসায়নবিদ মিশার (Misher) নিউক্লিয়াসে আবিস্কৃত এই পদার্থটির নামকরণ করেন নিউক্লিন (nuclein)। ১৮৮৯ সালে অল্টম্যান (Altaman) নিউক্লিনে অ্যাসিডের ধর্ম দেখতে পান এবং তিনি এর নামকরণ করেন নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিড কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস মৌল নিয়ে গঠিত। এতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১৫% এবং ফসফরাসের পরিমাণ ১০%। জীবকোষে দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে। (i) ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) ও (ii) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)। DNA নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিনে পাওয়া যায়। RNA এর শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায় সাইটোপ্লাজমে এবং বাকি ১০ ভাগ পাওয়া যায় নিউক্লিওলাসে। জীবকোষে প্রোটিন সংশ্লেষ-এর নির্দেশনা ও জেনেটিক তথ্য স্থানান্তরণ নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা সম্পন্ন হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম, নিউক্লিওলাস এবং ক্রোমোসোমের মধ্যে।

চিত্র : পাইরিমিডিন জাতীয় নাইট্রোজেন ক্ষারকের রাসায়নিক গঠন।

চিত্র : পিউরিন জাতীয় নাইট্রোজেন ক্ষারকের রাসায়নিক গঠন।
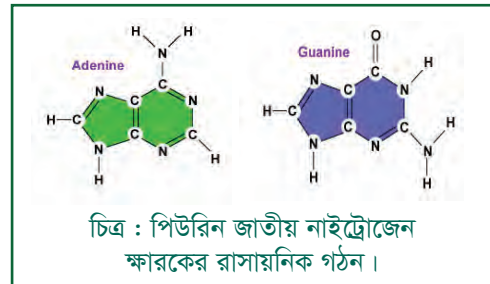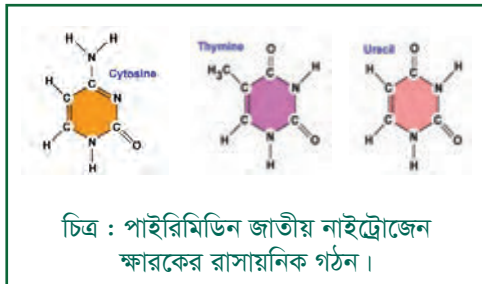
নিউক্লিক অ্যাসিডের মূল উপাদান ঃ নিউক্লিক অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিসের পর নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়। ১। পেন্টোজ শ্যুগার ২। নাইট্রোজেন ক্ষারক ৩। ফসফোরিক অ্যাসিড।

১। **পেন্টোজ শ্যুগার (Pentose sugar) ঃ** পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট শ্যুগার (চিনি)-কে বলা হয় পেন্টোজ শ্যুগার। নিউক্লিক অ্যাসিডে দুধরনের পেন্টোজ শ্যুগার থাকে। এর একটি রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যটি ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। RNA -তে রাইবোজ শ্যুগার এবং DNA -তে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার থাকে। পেন্টোজ শ্যুগার ফসফোরিক অ্যাসিডের সাথে এস্টার গঠনে সক্ষম। রিং স্ট্রাকচার বিশিষ্ট -D রাইবোজ অথবা ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন করে। রাইবোজ এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার প্রায় একই রকম গঠন বিশিষ্ট পার্থক্য শুধু এই যে, ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের ২নং কার্বনে অক্সিজেন অনুপস্থিত।

২। **নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক (Nitrogenous bases) ঃ** নিউক্লিক অ্যাসিডে দুই প্রকার নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে। নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে এই ক্ষারকসমূহ গঠিত। ক্ষারক গঠনকারী মৌলগুলো এক বা দুটি বলয় বা রিং সৃষ্টি করে এক একটি ক্ষারক গঠন করে। এই বলয় বা রিং এর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্ষারক দুই প্রকার; যথা-(i) পাইরিমিডিন এবং (ii) পিউরিন।

(i) **পাইরিমিডিন (Pyrimidine) :** এক বলয় বিশিষ্ট বা বেনজিনের মতো এক রিং বিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পাইরিমিডিন। এর সাধারণ সংকেত হল $C_4H_4N_2$। নিউক্লিক অ্যাসিডে তিন প্রকার পাইরিমিডিন ক্ষারক থাকে যথা-থাইমিন (thymine), সাইটোসিন (cytosine) এবং ইউরাসিল (uracil)।

(ii) **পিউরিন (Purine) ঃ** দুই বলয় বিশিষ্ট বা দুটি অসম রিং বিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পিউরিন। এর সাধারণ সংকেত হল $C_5H_4N_4$ নিউক্লিক অ্যাসিডে দুই প্রকার পিউরিন ক্ষারক থাকে, যথা-অ্যাডিনিন (adenine) এবং গুয়ানিন (guanine)।

শিক্ষার্থীর কাজঃ নিউক্লিক এসিড কী?

৩। **ফসফোরিক অ্যাসিড (Phosphoric acid) :** নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি অন্যতম উপাদান হল ফসফোরিক অ্যাসিড। এর আণবিক সংকেত H_3PO_4 ।

নিউক্লিওসাইড (Nucleoside) : এক অণু নাইট্রোজেন ক্ষারক ও এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার যুক্ত হয়ে গঠিত গ্লাইকোসাইড যৌগকে বলা হয় নিউক্লিওসাইড। ক্ষারক পাইরিমিডিন হলে তাকে বলা হয় পাইরিমিডিন নিউক্লিওসাইড, আর ক্ষারক পিউরিন হলে তাকে বলা হয় পিউরিন নিউক্লিওসাইড। পাইরিমিডিন নিউক্লিওসাইডে ক্ষারকের ১নং নাইট্রোজেন শ্যুগারের ১নং কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকের সাথে গ্লাইকোসাইড বন্ধনে যুক্ত থাকে। কিন্তু পিউরিন নিউক্লিওসাইডে ক্ষারকের ৯নং নাইট্রোজেন (১নং নয়) শ্যুগারের ১নং কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকের সাথে গ্লাইকোসাইড বন্ধনে যুক্ত থাকে।

নিউক্লিওটাইট (Nucleotide) : এক অণু নিউক্লিওসাইড-এর সাথে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু নিউক্লিওটাইট। অন্যভাবে বলা যায়, নিউক্লিওসাইডের ফসফেট এস্টার হল নিউক্লিওটাইড। নিউক্লিক অ্যাসিডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কতকগুলো নিউক্লিওটাইড একক। কাজেই বলা যায়, নিউক্লিওটাইড হল নিউক্লিক অ্যাসিডের গাঠনিক একক। এক অণু নাইট্রোজেন গঠিত ক্ষারক, এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার এবং এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠিত যৌগের নাম নিউক্লিওটাইড। শ্যুগার এর ৫নং কার্বনের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়।

বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিওটাইড :

শ্যুগার রাইবোজ হলে :

অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট = AMP = অ্যাডিনিন নিউক্লিওটাইড (অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড)
গুয়ানোসিন মনোফসফেট = GMP = গুয়ানিন নিউক্লিওটাইড (গুয়ানিলিক অ্যাসিড)
সাইটিডিন মনোফসফেট = CMP = সাইটোসিন নিউক্লিওটাইড (সাইটিডিলিক অ্যাসিড)
ইউরিডিন মনোফসফেট = UMP = ইউরাসিল নিউক্লিওটাইড (ইউরিডিলিক অ্যাসিড)

শ্যুগার ডিঅক্সিরাইবোজ হলে :

ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট = dAMP = অ্যাডিনিন ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড (ডিঅক্সি অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড)
ডিঅক্সি গুয়ানোসিন মনোফসফেট = dGMP = গুয়ানিন ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড (ডিঅক্সি গুয়ানিলিক অ্যাসিড)
ডিঅক্সি সাইটিডিন মনোফসফেট = dCMP = সাইটোসিন ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড (ডিঅক্সি সাইটিডিলিক অ্যাসিড)
ডিঅক্সি থাইমিডিন মনোফসফেট = dTMP = থাইমিন ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড (ডিঅক্সি থাইমিডিলিক অ্যাসিড)
অর্থাৎ ক্ষারকের (বা নিউক্লিওসাইডের) নামানুসারে নিউক্লিওটাইডের নামকরণ করা হয়।

কাজ : নিউক্লিওটাইডগুলো DNA ও RNA তৈরির মূল কাঠামো গঠন করে। এছাড়া মধ্যবর্তী বিপাকে (NAD+ এবং NADP+), প্রোটিন সংশ্লেষণে (GTP), শ্বসনে (ATP), ফসফোলিপিড সংশ্লেষণে (CTP) বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ডাইনিউক্লিওটাইড (Dinucleotide) : একটি নিউক্লিওটাইড যখন আরেকটি নিউক্লিওটাইডের সাথে ফসফো-ডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয় তখন তাকে ডাইনিউক্লিওটাইড বলে। ১ম নিউক্লিওটাইডের পেন্টোজ শ্যুগারের ৫নং কার্বনের সাথে এবং ২য় নিউক্লিওটাইডের পেন্টোজ শ্যুগারের ৩নং কার্বনের সাথে ফসফেট ডাই এস্টার বন্ধনদ্বারা যুক্ত হয় ফলে ডাই নিউক্লিওটাইড গঠিত হয়।

পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleotide) : অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড ৫ - ৩ অণুমুখী হয়ে পরপর ফসফোডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে একটি লম্বা রৈখিক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তখন তাকে পলিনিউক্লিওটাইড বলে। পলিনিউক্লিওটাইড একটি চেইন-এর মত গঠন সৃষ্টি করে। এই চেইন-এ ফসফেট অণু একদিকে পেন্টোজ শ্যুগার (রাইবোজ অথবা ডি-অক্সিরাইবোজ)-এর ৫নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এবং অপরদিকে পাশের পেন্টোজ শ্যুগার-এর ৩নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। DNA অণুর প্রতিটি একক হেলিক্স একটি পলিনিউক্লিওটাইড চেইন।

নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকার : নিউক্লিক অ্যাসিডে বিদ্যমান পেন্টোজ শ্যুগারটি রাইবোজ, না ডিঅক্সিরাইবোজ তার উপর ভিত্তি করে নিউক্লিক অ্যাসিডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা– (১) ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA এবং (২) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA ।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
নিউক্লিক এসিড বলতে কী বুঝ?	নিউক্লিক এসিডের উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic acid) (DNA)

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড Deoxyribonucleic acid (DNA) : সজীব কোষে অবস্থিত স্বপ্রজননশীল, পরিব্যক্তিতে সক্ষম, বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কাজের নিয়ন্ত্রক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক নিউক্লিক অ্যাসিডকে DNA বা ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বলে।

বিস্তৃতি : কয়েক প্রকার ভাইরাস ব্যতীত সকল প্রকার সজীব কোষেই DNA বিদ্যমান। DNA প্রধানত নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিশেষত ক্রোমোসোমের মধ্যে অবস্থিত। এছাড়া কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু যথা-মাইট্রোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, সেন্ট্রিওল প্রভৃতির মধ্যেও DNA উপস্থিত থাকে। DNA এর পরিমাণ Picogram সংক্ষেপে চম নামক একক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Pg = 10-12 gram.

আবিষ্কার : ১৮৬৮ সালে Miescher প্রথম DNA আবিষ্কার করেন। তিনি একে নিউক্লিন (nuclein) আখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে Levene (১৯১০) এবং Shoenheimer, Mirsky and Ris (১৯৩৮)-এর কিছু মৌলিক গবেষণা ছাড়া DNA-র গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। DNA-র গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ওয়াটসন ও ক্রিক (James Watson & Francis Crick, ১৯৫৩)-এর আবিষ্কারের মাধ্যমে।

DNA-র ভৌত ধর্ম : DNA-র আণবিক ওজন ১০৬ থেকে ১০৯ এর মধ্যে। ১০০০° C তাপমাত্রায় DNA অণু ভেঙ্গে দুটি অণু গঠন করে। অতি বেগুনি (বা আলট্রা ভায়োলেট, UV) আলোকরশ্মি শোষণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।

ভৌত গঠন : J.D. Watson ও F. Crick ১৯৫৩ সালে DNA অনুসূত্রের যে গাঠনিক মডেল প্রদান করেন তা ডবল হেলিক্স (double helix) বা জোড় কুন্ডলী নামে পরিচিত এবং এই মডেল প্রস্তাবের জন্য তারা ১৯৬৩ সালে বিজ্ঞানী Wilkins সহ ওয়াটসন ও ক্রিক নোবেল পুরস্কার পান।

শিক্ষার্থীর কাজঃ DNA কী?

চিত্র : DNA ডবল হেলিক্স (ওয়াটসন-ক্রিক মডেল)
P = ফসফেট, ⬠ = শ্যুগার, A = অ্যাডিনিন, T = থাইমিন, G = গুয়ানিন C = সাইটোসিন, (=, =) হাইড্রোজেন বন্ড।
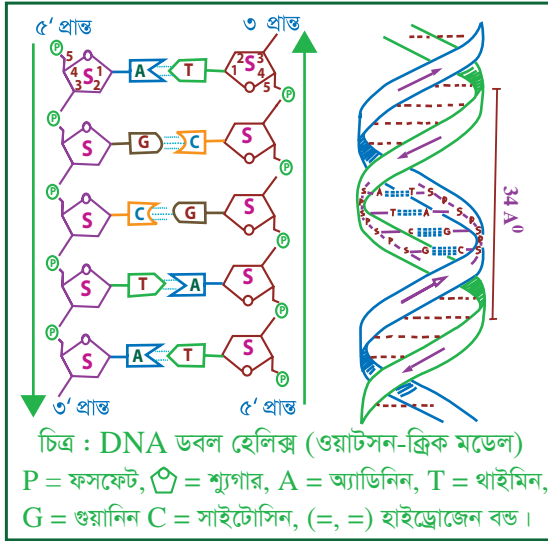
চিত্র : DNA ডবল হেলিক্স

DNA ডবল হেলিক্স এর গাঠনিক বৈশিষ্ট্য : ওয়াটসন ও ক্রিক প্রদত্ত DNA এর ডবল হেলিক্স এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো- DNA সাধারণত ২ হেলিক্সযুক্ত এবং প্রতিটি হেলিক্স একটি পলিনিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খল। DNA বিন্যাস ঘুরানো সিঁড়ির মত। সিঁড়ির মত প্যাঁচানো সূত্র ২টি একটি কাল্পনিক মধ্যঅক্ষকে ঘিরে থাকে।হেলিক্স দুইটি প্লেক্টোনোমিক পদ্ধতিতে পরস্পর কুন্ডলিত থাকে। কুন্ডলন ডানমুখী। সিঁড়ির দুই দিকের ফ্রেম তৈরী হয় শ্যুগার ও ফসফেটের পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে। দুই দিকের ফ্রেমের মাঝখানে প্রতিটি ফ্রেম তৈরী হয় একজোড়া নাইট্রোজেনাস বেস দিয়ে। নাইট্রোজেন বেস গুলি হল – (i) অ্যাডিনিন (A) ; (ii) গুয়ানিন (G); (iii) থাইমিন (T); (iv) সাইটোসিন (C)। অ্যাডিনিন (A) সব সময় থাইমিনের (T) সাথে এবং গুয়ানিন (G) সব সময় সাইটোসিনের (C) এর সাথে জোড় তৈরী করে।

দুটি নাইট্রোজেন বেস হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে। এক ফ্রেমের গুয়ানিন (G) অপর পাশে সাইটোসিনের সাথে ৩টি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত হয় (G ≡ C)। এক ফ্রেমের অ্যাডিনিন অপর পাশের ফ্রেমের থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা সংযুক্ত থাকে (A = T)। হেলিক্স এর ব্যাস 2nm। দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হতে পারে। হেলিক্সে প্রতি প্যাঁচে ১০টি ক্ষারক জোড় থাকে। 3.4nm পর পর একেকটি প্যাঁচ গঠিত হয়। (10=3.4nm) এবং প্রত্যেক ক্ষারক জোড় পরস্পর থেকে .34nm দূরত্বে অবস্থান করে। প্রতিটি প্যাঁচে থাকে প্রায় ২৫টি হাইড্রোজেন বন্ড। হেলিক্সে ঘূর্ণনের ফলে দুইটি অসমান খাঁজের সৃষ্টি হয়। একটি সংকীর্ণ অগভীর খাঁজ যার ব্যাস 12 nm ও অন্যটি চওড়া গভীর খাঁজ যার ব্যাস 22 nm। (ক) এক অণু ডি-অক্সিরাইবোজ শ্যুগার (খ) একটি ফসফেট (গ) ১ অণু নাইট্রোজেন বেস (পিউরিন বা পাইরিমিড) থাকে। ক্ষারকগুলো হেলিক্সের অর্ন্তমূখী এবং শর্করা ফসফেট বন্ধনী বর্হিমুখী থাকে। DNA double হেলিক্স ২টি বিপরীতমুখী সূত্র নিয়ে গঠিত। একটি ৫´- ৩´ এবং অপরটি ৩´- ৫´ মুখী।

DNA-এর রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of DNA) ঃ যে সব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে DNA গঠিত সে সব রাসায়নিক পদার্থই হল DNA-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান। এক খন্ড DNA-কে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ফসফোরিক অ্যাসিড ও নিউক্লিওসাইড। নিউক্লিওসাইডকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নাইট্রোজেন ক্ষারক এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারকসমূহকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নামক ক্ষারক (নাইট্রোজেন বেস)। কাজেই (ডিঅক্সিরাইরোনিউক্লিক অ্যাসিড)-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান হল (১) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, (২) ফসফোরিক অ্যাসিড (একটি ফসফেট) এবং (৩) একটি নাইট্রোজেন ক্ষারক। ক্ষারকটি সাইটোসিন বা থাইমিন নামক পাইরিমিডিন কিংবা অ্যাডিনিন বা গুয়ানিন নামক পিউরিন হতে পারে। কিন্তু কখনও ইউরাসিল নামক পাইরিমিডিন থাকবে না। অ্যাডেনিন ও গুয়ানিনকে বলা হয় পিউরিন (Purine) এবং সাইটোসিন ও থাইমিনকে বলে পাইরিমিডিন (Pyrimidine)। রাসায়নিক পদার্থগুলো কিভাবে সজ্জিত থেকে DNA সূত্র গঠন করে সে সম্পর্কে ওয়াটসন ও ক্রিক ১৯৫৩ সালে একটি মডেল প্রদান করেন। এটি হলো DNAডাবল হেলিক্স মডেল এবং প্রস্তাবের জন্য তাঁরা ১৯৬৩ সালে আরেক বিজ্ঞানী, উইলকিন্স-সহ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

DNA অনুলিপন প্রক্রিয়া ঃ যে প্রক্রিয়ায় DNA ডবল হেলিক্সের ক্ষারক জোড় খুলে গিয়ে প্রত্যেক সূত্র একটি ছাঁচ হিসেবে কাজ করে অবিকল আরেকটি DNA অণুসূত্রের সৃষ্টি করে তাকে DNA অনুলিপন বলে। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের বিভাজন প্রকৃতপক্ষে DNA অণুর অনুলিপন এর উপর নির্ভরশীল। DNA অনুলিপন সাধারণত অর্ধ রক্ষণশীল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। যে অনুলিপন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অপত্য ডবল হেলিক্সের ১টি মাতৃসূত্র ও অন্যটি নতুন অপত্য DNA সূত্র নিয়ে গঠিত থাকে তাকে অর্ধরক্ষণশীল DNA অনুলিপন বলে। DNA অনুলিপন প্রক্রিয়াটি অতিদ্রুত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন হয় এতে বিশ ধরনের প্রোটিন ও বহু এনজাইম অংশগ্রহণ করে। DNA অনুলিপনের সাথে সম্পৃক্ত এনজাইম প্রোটিন ও তার উপাদানগুলোকে একত্রে DNA Replicase সংক্ষেপে Replisome বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ: DNA এর রাসায়নিক গঠনে কী কী উপাদান থাকে?

DNA অনুলিপন নিম্নলিখিত ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় ঃ

১। **উৎপত্তিস্থল শনাক্তকরন ঃ** অনুলিপনের শুরুতে DNA অণুর বিভিন্ন স্থানে ডাবল হেলিক্স খুলে গিয়ে বুদবুদ আকৃতি ধারণ করে। সৃষ্ট বুদবুদকে Replication Origin বা সংক্ষেপে ওরি (Ori) বলে। প্রতিটি ওরি প্রায় ৩০০ নিউক্লিওটাইড সমন্বিত।

চিত্র : DNA অনুলিপন প্রক্রিয়া (সূচনা)
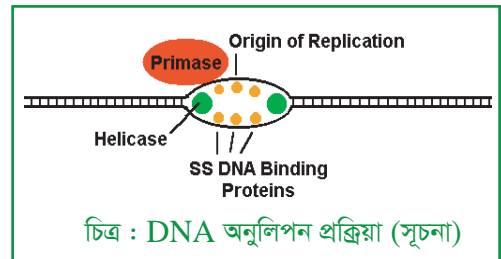
২। **মাতৃ DNA দ্বিসূত্রের প্যাঁচ খুলে যাওয়া এবং হাইড্রোজেন বন্ধন এর বিলোপ সাধন ঃ** DNA এর জোড়কুন্ডলীর একাংশের প্যাঁচ খুলে যাওয়ায় ঐ অংশের পিউরিন ও পাইরিমিডিনের ক্ষারকগুলি বেজোড় অবস্থায় পতিত হয়। প্যাঁচ খুলে যাবার সময় পিউরিন ও পাইরিমিডিন ক্ষারকের সংযোগ সাধনকারী হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙ্গে যায়। তখন থেকে ‘Y’ আকৃতি দেখায়। ‘Y’ আকৃতির অংশকে Replication fork বা অনুলিপন দ্বিবিভক্তি বলে। ফলে DNA অণুর একাংশ পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি হেলিক্স ছাঁচ হিসাবে কার্যকরী হয়।

৩। **ডবল হেলিক্সের প্যাঁচ মুক্ত অংশ পৃথক করে রাখা ঃ** DNA হেলিক্সের একটি একটি করে নাইট্রোজেন ক্ষারক জোড় মুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পেছনে ফেলে যাওয়া মুক্ত ক্ষারকগুলো যেন পুনরায় যুক্ত না হতে পারে সেজন্য ঐ অংশ এক ধরনের প্রোটিন যুক্ত হতে থাকে।
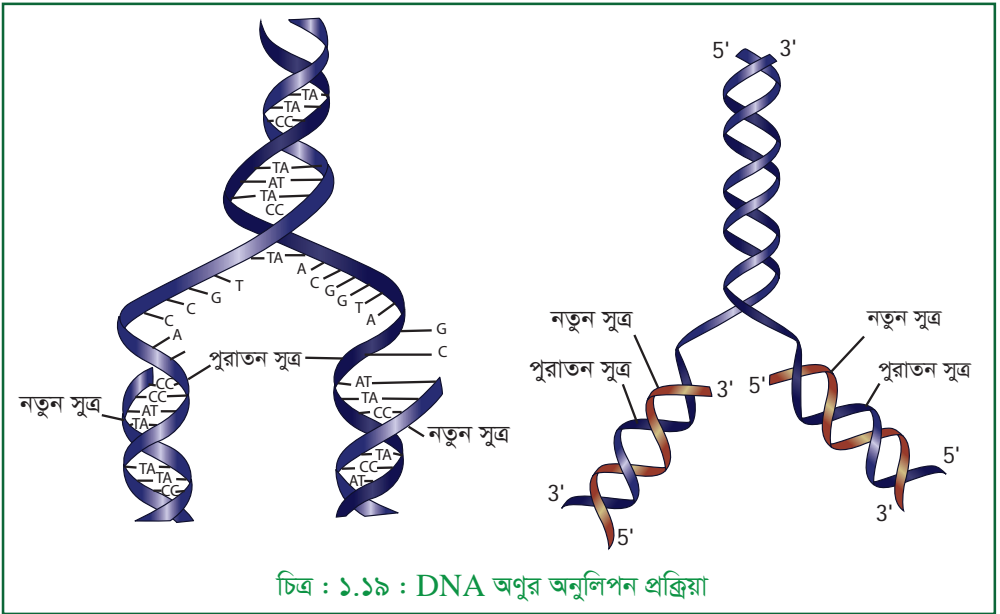
চিত্র : ১.১৯ : DNA অণুর অনুলিপন প্রক্রিয়া

এই প্রোটিনগুলোকে Single stranded binding Protein সংক্ষেপে SSBP বলে। এককেটি SSBP প্রায় ১০টি নিউক্লিওটাইড ক্ষারক জুড়ে অবস্থান করে। উপর আরেকটি করে পরিপূরক সূত্র তৈরী করার জন্য ছাঁচের মতো কাজ করে। নতুন অণু তৈরীর উদ্দেশ্যে সকল উপাদান অর্থাৎ ক্ষারক, চিনি (ডি-অক্সিরাইবোজ) ও ফসফেট নিউক্লিয়াসের মধ্যেই উপস্থিত থাকে এবং যথাসময়ে যথাস্থানে এসে পৌঁছে। DNA Polymerase এবং Mg++ আয়নের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেনাস ক্ষার, ডি-অক্সিরাইবোজ শ্যুগার এবং ফসফেট সমন্বয়ে গঠিত নতুন নিউক্লিওটাইডগুলি মাতৃসূত্রের বিন্যাস অনুযায়ী এদের বিপরীতে সজ্জিত হতে থাকে।

৪। সম্পূরক সৃষ্টি ঃ প্যাঁচ খুলে যাওয়া প্রতিটি DNA সূত্র তাদের উপর আরেকটি করে পরিপূরক সূত্র তৈরি করার জন্য ছাঁচের মতো কাজ করে। নতুন অণু তৈরীর উদ্দেশ্যে সকল উপাদান অর্থাৎ ক্ষারক, চিনি (ডি-অক্সিরাইবোজ) ও ফসফেট নিউক্লিয়াসের মধ্যেই উপস্থিত থাকে এবং যথাসময়ে যথাস্থানে এসে পৌঁছে। DNA Polymerase এবং Mg++ আয়নের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেনাস ক্ষার, ডি-অক্সিরোইবোজ শ্যুগার এবং ফসফেট সমন্বয়ে গঠিন নতুন নিউক্লিওটাইডগুলি মাতৃসূত্রের বিন্যাস অনুযায়ী তাদের বিপরীতে সজ্জিত হতে থাকে।

৫। ছাঁচের বেসের অনুক্রম অনুযায়ী সম্পূরক বেসের বিন্যাস ঃ নতুন সৃষ্ট সূত্র দুইটিতে ছাঁচের বেসের অনুক্রম অনুসারে সম্পূরক বেসগুলি বিন্যস্ত হতে থাকে। অর্থাৎ ছাঁচে যদি অ্যাডিনিন (A) থাকে তবে এর বিপরীতে সৃষ্ট নতুন সূত্রটিতে থাইমিন (T) সংযোজিত হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ছাঁচে সাইটোসিন (C) থাকলে তার বিপরীতে সৃষ্ট নতুন সূত্রে সম্পূরক বেস হিসাবে গুয়ানিন (G) সংযোজিত হয়। DNA Polymerase এনজাইম সবসময় নিউক্লিওটাইডকে বর্ধিষ্ণু নতুন হেলিক্স এর ঐ প্রান্তে যুক্ত করে। নতুন হেলিক্স সব সময় 5′ - 3′ অভিমুখে বৃদ্ধি পায়।

৬। হাইড্রোজেন বন্ধনীর সৃষ্টি ঃ ছাঁচ দুইটির সাথে নতুন সূত্র দুইটির ক্ষারক বিন্যাস সম্পূর্ণ হলে পুনরায় ঐ বন্ধন এর আবির্ভাব ঘটে। দুটি নিউক্লিওটাইড এর মধ্যকার খালিস্থানটি লাইগেজ এনজাইম এর সাহায্যে জোড়া লাগে। এভাবে একটি DNA অণু থেকে ২টি DNA অণুর সৃষ্টি হয়। DNA অনুলিপনের ফলে সৃষ্ট প্রতিটি নতুন ডবল হেলিক্স এ একটি পুরাতন হেলিক্স থেকে যায়।

এই ধরনের অনুলিপনকে অর্ধরক্ষণশীল অনুলিপন বলে। ক্ষুদ্রাকার DNA অনুলিপন প্রক্রিয়াটি DNA শৃঙ্খলের এক প্রান্তে হয়ে ক্রমান্বয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু বৃহদাকার DNA অণুতে অনুলিপন প্রক্রিয়াটি একই সাথে বিভিন্ন স্থানে শুরু হওয়ার ফলে DNA অণুর অনুলিপন ত্বরান্বিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজঃ DNA অনুলিপনের ধাপসমূহ কী কী?

DNA অনুলিপনের গুরুত্ব ঃ জীব জগতে DNA অনুলিপনের গুরুত্ব অপরিসীম। কোষ বিভাজন এবং গ্যামিট সৃষ্টির জন্য DNA অনুলিপন অত্যাবশ্যক।

DNA এর জৈবিক তাৎপর্য ঃ DNA বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। নিম্নবর্ণিত কারণগুলোর জন্য DNA কে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।

১। DNA দ্বারাই কোষের বিভাজনের সময় এক নির্ভুল প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়।
২। DNA বংশগতির সকল প্রকার জৈবিক সংকেত বহন করার ক্ষমতা রাখে।
৩। কোন জীবের সকল কোষে যে কোন ধরনের জৈবিক সংকেত এর প্রেরক হচ্ছে DNA।
৪। DNA কোষের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।
৫। DNA এর গঠন অত্যন্ত স্থায়ী এবং বিশেষ কোন কারণ ছাড়া (মিউটেশন) এর কোন পরিবর্তন হয় না।
৬। কোন কারণে DNA অণুর গঠনে কোন পরিবর্তন হলে পরিবৃত্তির উদ্ভব হয়। পরিবৃত্তিই হচ্ছে অভিব্যক্তির মূল উপাদান।
৭। DNA জিন সমূহের ধারক। এই জিনের মাধ্যমেই জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় এবং তা এক জনু থেকে অপর জনুতে স্থানান্তরিত হয়।
৮। জিন প্রকাশ পায় RNA তৈরীর মাধ্যমে এবং RNA তৈরী হয় DNA থেকে।
৯। কোষে যে সব প্রোটিন তৈরী হয় এর সরবরাহ করে DNA। সংশ্লেষিত প্রোটিনই জীবের ফিনোটাইপ প্রকাশের জন্য দায়ী। ফুলের রং, উদ্ভিদের উচ্চতা প্রভৃতি।
১০। DNA এর অনুলিপনের মাধ্যমে প্রতিরূপ সৃষ্টির জন্যই কোন জীবের, উদ্ভিদের জাতিসত্ত্বা বজায় থাকে।

DNA-এর কাজ (Functions of the DNA) ঃ ক্রোমোসোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রন করে। জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে। জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। জীবের পরিবৃত্তির (mutation)-ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। DNA এবং এর হেলিক্সে কোন অংশে গোলযোগ দেখা দিলে তা মেরামত করে নিতে সক্ষম। এটা বর্তমানে টিভিতে ব্যবহৃত রিমোট কন্ট্রোলের মত।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
DNA অণুর ভৌত গঠন কেমন?	DNA অণুর রাসায়নিক গঠনে কী কী উপাদান থাকে?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজঃ DNA ডাবল হেলিক্সের চিহ্নিত চিত্র অংকন করে আনবে।
DNA অনুলিপন এর ধাপ ও এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড Ribonucleic acid (RNA)

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড Ribonucleic acid (RNA) : যে নিউক্লিক অ্যাসিড এর পলিনিউক্লিওটাইডের মনোমার একক গুলোতে গাঠনিক উপাদান হিসাবে রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যতম বেস হিসাবে ইউরাসিল (থাইমিন থাকে না) থাকে তাকে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA বলে।

চিত্র : ১.২০ : RNA গঠন
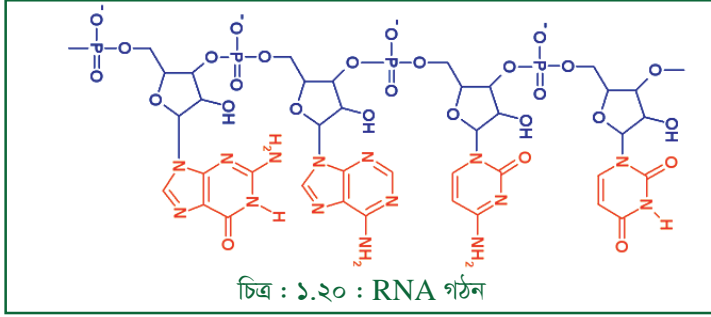
অবস্থান (বিস্তার) : সকল জীবকোষে RNA থাকে। সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোসোম, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডে RNA বিস্তৃত। ব্যাকটেরিয়া কোষেও RNA পাওয়া যায়। কিছু ভাইরাসের বংশগতি উপাদান হিসাবেও এটি উপস্থিত থাকে। অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA জেনেটিক পদার্থরূপে কাজ করে। সাধারণত কোষের শতকরা ৯০ ভাগ RNA থাকে সাইটোপ্লাজমে, বাকিটা নিউক্লিয়াসে। সাইটোপ্লাজমে RNA মুক্ত অবস্থায় এবং রাইবোসোমেও RNA থাকে। DNA এর সহযোগী হিসাবে ক্রোমোসোমে RNA থাকে।

গঠন : RNA একটি একসূত্রক নিউক্লিক acid এটি গঠিত হয় – (১) রাইবোজ শ্যুগার (৫-c বিশিষ্ট)

(২) নাইট্রোজেনাস ক্ষারক:

অ্যাডিনিন	A	পিউরিন	ইউরাসিল	U	পাইরিমিডিন
গুয়ানিন	G		সাইটোসিন	C	
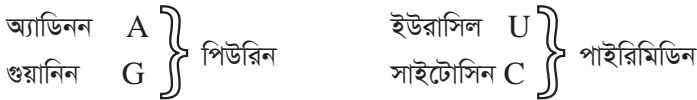
(৩) ফসফরিক অ্যাসিডফলে শুধু চারধরনের নিউক্লিওটাইড তৈরী হতে পারে। যথা–ফসফরিক acid + শ্যুগার + অ্যাডিনিন, ফসফরিক acid + শ্যুগার + গুয়ানিন, ফসফরিক acid + শ্যুগার + ইউরাসিল, ফসফরিক acid + শ্যুগার + সাইটোসিন

RNA অণু একসূত্র বিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইড। সূত্রটি একসূত্র হলেও কখনও কখনও এই দীর্ঘ সূত্রটি কোন কোন জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে দ্বিসূত্রযুক্ত দেখায়। তবে সব জায়গায় ভাঁজ হয় না বলে সম্পূর্ণ RNA অণুটি কখনও দ্বিসূত্রযুক্ত অবস্থায় থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ: RNA কী? কি কি নিয়ে গঠিত?

RNA অণুসূত্রের আকার ও সংখ্যা : RNA সূত্রের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যার উপর। ক্ষুদ্রতর RNA সূত্রে ২২টি (মাইক্রো RNA) এবং বড় অণুতে ১০,০০০ নিউক্লিওটাইড (mRNA) থাকতে পারে। একটি কোষে কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত RNA অণু থাকতে পারে। এই সংখ্যা নির্ভর করে প্রজাতি, কোষের বৈশিষ্ট্য ও কর্মকান্ডের উপর।

RNA এর বৈশিষ্ট্য : অসংখ্য পলিনিউক্লিওটাইড সমন্বয়ে RNA গঠিত হয়। RNA একক হেলিক্স যুক্ত। ব্যতিক্রম ঃ রিও–ভাইরাস। এটি নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারক, রাইবোজ শ্যুগার ও ফসফেট সমন্বয়ে গঠিত। নাইট্রোজেন গঠিত ক্ষারকগুলো হলো অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিল। RNA কোষে সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুতে এবং নিউক্লিয়াসে বর্তমান থাকে।

RNA এর প্রকারভেদ ঃ RNA সাধারণত প্রোটিন সংশ্লেষের কাজে অংশগ্রহণ করলেও কোন কোন জীবে RNA বংশগতির চরিত্রবাহক হিসাবেও কার্যকরী হয়। কাজেই RNA কে সাধারণত ২ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা –

(১) জেনেটিক RNA (Genetic RNA) ; (২) নন জেনেটিক RNA (Non genetic RNA) ;

১। জেনেটিক RNA (Genetic RNA) ঃ অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে বংশগতির বৈশিষ্টাবলীর বাহক হিসাবে RNA কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের RNA কে Genetic RNA নামে আখ্যায়িত করা হয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিওফাজে DNA এর পরিবর্তে RNA অণুই বংশগতির বাহক হিসাবে কার্যকরী হয়। উদাহরণ ঃ TMV বা টোবাকো মোজাইক ভাইরাস।

জেনেটিক RNA একসূত্রক অথবা দ্বিসূত্রক হতে পারে। দ্বিসূত্রক RNA অণুতে বেস জোড়ের বিন্যাস DNA অণুর বেস জোড়ের অনুরূপ তবে বেস জোড়গুলি ঃ

A ---- U G ----- C

২। নন জেনেটিক RNA (Non genetic RNA) ঃ অধিকাংশ জীবে RNA যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বংশগতির বাহক হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা DNA দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সেই RNA কে নন জেনেটিক RNA বলে। এই প্রকার নন জেনেটিক RNA অণু DNA অণুর ছাঁচ থেকে সৃষ্টি হয়। কোন কোষে RNA অণুর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। কোন কোষে পুষ্টির উপর নির্ভর করে RNA অণুর সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে। নন জেনেটিক RNA কে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা – (i) বার্তাবহ RNA (mRNA) (ii) রাইবোসোমাল RNA (rRNA) (iii) ট্রান্সফার RNA (tRNA)

(i) বার্তাবহ RNA (mRNA) ঃ যে সব RNA জিনের সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষের ছাঁচ হিসাবে কার্যকর হয়ে নির্দিষ্ট amino acid অনুক্রম বাছাই করে, সেই প্রকার RNA কে বার্তাবহ RNA (mRNA) বলে। DNA অণুর কাছ থেকে বার্তা সংগ্রহ করে প্রোটিন সংশ্লেষের ছাঁচ হিসাবে কার্যকরী হয়।

চিত্র: বার্তাবহ RNA (MRNA) এর গঠন

ইউক্যারিওটিক কোষে m RNA নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। একটি কোষের সমুদয় RNA এর এটি একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (সাধারণত শতকরা ৫ ভাগ হতে ১০ ভাগ) এরা কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। যে ক্ষারক সংকেতের মাধ্যমে m RNA বিশেষ অ্যামাইনো অ্যাডিকে চিহ্নিত করে একে Genetic কোড বলে। mRNA লম্বা চেইনের মত। mRNA এর 5´ প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এই প্রান্তকে ৫´ লিডার (৫´ Leader) বলে। আবার ৩´ প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এই প্রান্তকে ৩´ ট্রেইলার (৩´ trailer) বলে। মাঝখানের অংশকে কোডিং অংশ বলে (coding region) বলে। পরপর ৩টি বেস মিলে ১টি কোডন হয়। একটি mRNA অণুতে গড়ে ১,০০০ টি নিউক্লিওটাইড থাকে। m RNA অণু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। একটি mRNA অণু সাধারণত এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করে এবং কাজ শেষে বিলীন হয়ে যায়। এদের আয়ুকাল মাত্র কয়েক মিনিট। mRNA অণুর আণবিক ওজন ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ।

শিক্ষার্থীর কাজ: RNA কত প্রকার ও কি কি?

RNA অণুর কাজ ঃ (i) নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে এবং রাইবোসোম ও ঃ RNA এর সহায়তায় নির্দিষ্ট amino acid অনুক্রমের শৃঙ্খল তৈরি করে।

চিত্র : rRNA

(ii) রাইবোসোমাল RNA (rRNA) ঃ যে সব RNA রাইবোসোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসাবে কাজ করে, তাকে রাইবোসোম RNA (rRNA) বলে। রাইবোসোমাল জিন থেকে এদের সংশ্লেষণ ঘটে। কোন কোষের সমুদয় RNA অণুর শতকরা ৮০ – ৯০ ভাগ রাইবোসোমাল RNA (r-RNA) এরা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং অদ্রবণীয়। রাইবোসোমের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী r-RNA ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।
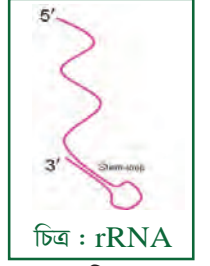
কাজ ঃ রাইবোসোম নামক কোষ অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে যার মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাইবোসোমাল RNA প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন কণা (ribonuclco protein particle) গঠন করে।

চিত্র : ১.২১ : tRNA এর গঠন।

(iii) ট্রান্সফার RNA (tRNA) ঃ যে সব RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী একেকটি amino acid কে mRNA অণুতে স্থানান্তরিত করে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে তাকে ট্রান্সফার RNA (tRNA) বলে। নিউক্লিয়াসের ভিতর tRNA তৈরী হয়। প্রত্যেক কোষে প্রায় ৩১ – ৪২ ধরনের tRNA থাকে। প্রতিটি tRNA তে মোটামোটি ৯০টি নিউক্লিয়োটাইড থাকে।

প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ঃ RNA একসূত্রক এবং লম্বা চেইনের মত থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভাঁজ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বেস এর মধ্যে জোড়ার সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি RNA তে একাধিক 'ফাঁস' (loop) সৃষ্টি করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁস (loop) হল অ্যান্টিকোডন ফাঁস যা mRNA এর কোডন এর সাথে মুখে মুখে বসে যেতে পারে।
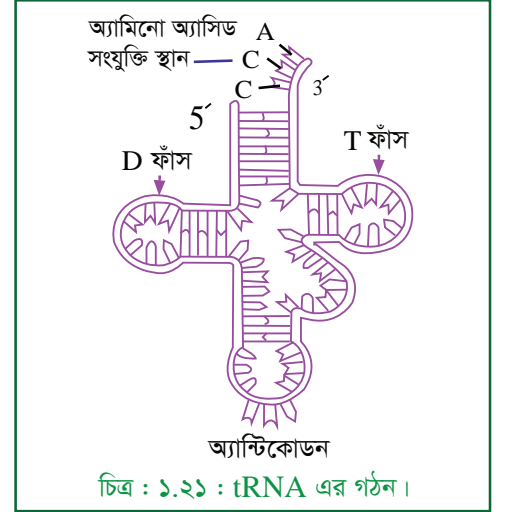
tRNA এর ৩´ প্রান্ত একসূত্রক এবং সবসময় CCA ধারায় বেস সজ্জিত থাকে। এখানে amino acid সংযুক্ত হয়। ফাঁস অবস্থায় সবসময়ই অ্যান্টিকোডন ফাঁস ও অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট বিপরীত অবস্থানে থাকে। ৩টি বেস নিয়ে অ্যান্টিকোডন সৃষ্টি হয়। tRNA এর আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েকদিন।

tRNA এর কাজ ঃ প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় জেনেটিক কোড অনুযায়ী amino acid কে mRNA অণুতে স্থানান্তর করা।

এই ৩ প্রকার RNA ছাড়া আরও এক প্রকার RNA সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই প্রকার RNA এর নাম মাইনর RNA। Minor RNA সাইটোপ্লাজমীয় RNA (sc RNA) ও নিউক্লিয় RNA (sn RNA) নামে কিছু ক্ষুদ্র RNA রয়েছে যারা কোষে বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইমের কাঠামো দান করে। এই জাতীয় কিছু RNA-র মধ্যে এনজাইমের বৈশিষ্ট্য থাকায় এগুলোকে রাইবোজাইম (ribozyme) নামে অভিহিত করা হয়। যেমন –রাইবোনিউক্লিয়প্রোটিন।

কাজ ঃ কয়েক ধরনের এনজাইমের কাঠামো দান করা এবং এনজাইম হিসাবে কাজ করা।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
RNA এর প্রকারভেদগুলি কী কী?	mRNA, rRNA, tRNA অণুর গঠন ও কাজগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: mRNA, rRNA, tRNA অণুর চিহ্নিত চিত্র অংকন করে আনবে।

ট্রান্সক্রিপশন

জীবের দ্বিসূত্রক DNA থেকে একসূত্রক mRNA সংশ্লেষ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ট্রান্সক্রিপশন বলে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বিসূত্রক DNA অণুর জেনেটিক তথ্য এক সূত্রক mRNA তে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় RNA এর তথ্য বিশেষত: mRNA এর বংশগতীয় বার্তাসমূহ বা বংশগতীয় সংকেতসমূহ (Genetic code) বহন করে এবং এই সব বংশগতীয় তথ্য ব্যবহার করে। বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। পরবর্তীতে এইসব প্রোটিনের মূলত: এনজইমের সাহায্যে জীবের ফিনোটাইপের প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রক্রিয়া : প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানের হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলো DNA নির্ভরশীল RNA পলিমারেজ এনজাইমের প্রভাবে ভেঙ্গে সূত্র দুইটি পৃথক হয়ে যায়। পৃথক হয়ে যাওয়া সূত্র দুইটির মধ্যে একটি সূত্র Template বা ছাঁচের ন্যায় কাজ করে ও mRNA তৈরি করে। mRNA তৈরি হওয়ার পর এরা নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের রন্ধ্রপদ দিয়ে বের হয়ে সাইসোপ্লাজমে আসে এবং Mg^{++} আয়নের উপস্থিতিতে রাইবোজোমের সাথে যুক্ত হয়। DNA হতে mRNA তৈরি সম্পন্ন হওয়ার পর ননসেন্স কোডের সাহায্যে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

চিত্র : ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া

জিনের বহি:প্রকাশে ট্রান্সক্রিপশন অপরিহার্য ধাপ। DNA নির্ভর RNA পলিমারেজ (DNA dependent RNA polymerase) এনজাইমের সাহায্যে DNA থেকে সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে mRNA ট্রান্সক্রাইভ বা কপি হয়।

E.coli ব্যাকটেরিয়ায় জীবিত অবস্থায় (in vivo) ট্রান্সিক্রিপশন প্রক্রিয়ায় ১৫–৫৫টি পর্যন্ত বেস এবং এই ব্যাকটেরিয়ায় কৃত্রিম অবস্থায় (in vitor) ১০০টি পর্যন্ত বেস প্রতি সেকেন্ডে কপি হয়।

রিও ভাইরাসে (সুস্থ্য মানুষের পরিপাক ও শ্বাসনালীতে এই ভাইরাস থাকে) এর জিনোম গঠিত হয় স্বতন্ত্রভাবে। double strand RNA খন্ড দ্বারা সংক্রমিত কোষে প্রতিটি খণ্ড থেকে ভাইরাসের RNA নির্ভর RNA পলিমারেজ এনজাইম ও এর প্রভাব এক সূত্রক mRNA উৎপন্ন হয়। এই mRNA এর অণুগুলো সরাসরি ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ভাইরাসের পলিপেপটাইড অণুসমূহ উৎপন্ন করে।

ট্রান্সক্রিপশন একক কয়েকটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১. প্রোমোটার (Promoter), ২. প্রারম্ভ স্থান / প্রারম্ভ বিন্দু (start point) ৩. চূড়ান্তকারী স্থান (Terminator site)।

Promoter এ RNA পলিমারেজ এনজাইম সংযুক্ত হয়। প্রারম্ভ স্থান থেকে RNA ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় ও চূড়ান্তকারী স্থানে গিয়ে শেষ হয়। প্রারম্ভ বিন্দু একটি মাত্র বেস গঠন করে, অন্য অংশগুলোতে একাধিক বেস থাকে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
ট্রান্সক্রিপশন কী?	ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটে?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটে বর্ণনা করে লিখে আনবে।

ট্রান্সলেশন

mRNA তে বিদ্যমান বংশগতি সংকেতসমূহকে ভিত্তি করে প্রোটিন অণুর সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নাম ট্রান্সলেশন। Replication ও Transcription এর পর জিনের বহি:প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদিকোষী জীবে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া একই সাথে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত কোষী জীবে এই দুটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে।
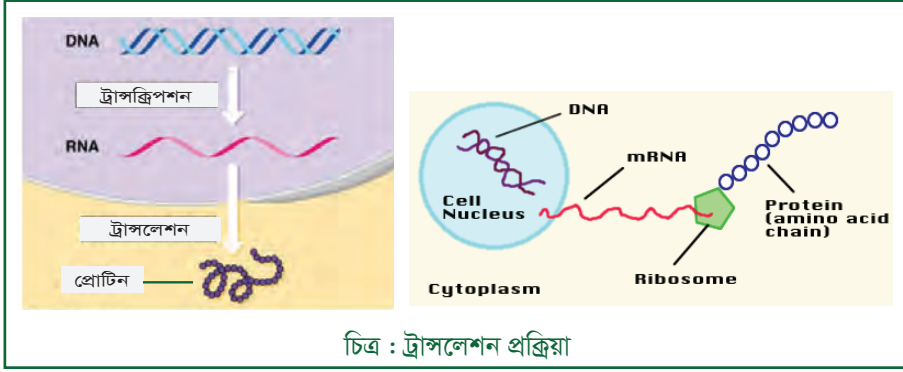
চিত্র : ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া

ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নোক্ত উপকরণগলো প্রয়োজন: i) mRNA ii) বিভিন্ন প্রকার amino acid iii) tRNA, iv) পেপটাইড বন্ধনী সৃষ্টিকারী, প্রোটিন সংশ্লেষণ আরম্ভকারী ও চূড়ান্তকারী প্রভৃতি এনজাইম, v) শক্তি সরবরাহকারী দ্রব্য যেমন- ATP, GTP, vi) কতগুলো coenzyme বা cofactor.

প্রথমে DNA এর অংশ বিশেষকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে mRNA সিন্থেটেজ দ্বারা mRNA এবং tRNA সমূহের ট্রান্সক্রিপশন ঘটে এবং এগুলো সাইটোপ্লাজমে পৌছে। রাইবোসোমের সাথে mRNA সংযুক্ত হয়। এখানে tRNA একটি একটি করে amino acid অণু রাইবোসোমে অবস্থিত mRNA এর কাছে আনে ও mRNA সাথে যুক্ত করে মুক্ত হয়। এভাবে mRNA তে অসংখ্য amino acid অণু সংযুক্ত হয়ে যখন প্রোটিন অণু তৈরী হয় তখন রাইবোজোম এর mRNA থেকে প্রোটিন অণু মুক্ত হয়ে কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হয়।

পরবর্তীতে Release factor পলিপেপটাইড শৃংখল মুক্ত করে। DNA হতে RNA এবং RNA থেকে প্রোটিন উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বংশানুসৃত 'সংবাদ' একমুখী যা DNA থেকে RNA হয়ে প্রোটিন অভিমুখী যায়।

প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া :

অসংখ্য amino acid পলিপেপটাইড বন্ড এর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রোটিন অণু গঠন করে। এই প্রোটিন সংশ্লেষণ DNA তথা জিন দ্বারাই পরিচালিত হয়। যেক্ষেত্রে DNA অনুপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে জেনেটিক RNA প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রোটিন সংশ্লেষণকালে রাইবোসোমের উপএকক দুটি (30+50=70S ও 60+40=80S) যুক্ত হয়ে রাইবোসোম গঠন সম্পন্ন করে। প্রতিবার একটি কোডন একটি পলিপেপটাইড প্রস্তুত করে। প্রথম কোডন অর্থকরণের পর অর্থাৎ পঠিত হলে রাইবোসোমটি সরে যায় এবং সেই স্থানে অপর একটি রাইবোসোম যুক্ত হয়। এভাবে mRNA এর সাথে একাধিক রাইবোসোম যুক্ত থাকায় এই অবস্থাকে পলিরাইবোসোম বলে।

পলিপেপাইড চেইন সংশ্লেষ কোষে রাইবোসোমের উপএকক দুটি পুনরায় বিশ্লেষিত হয়।

amino এসিডগুলো কেবলমাত্র সক্রিয় অবস্থায় tRNA এর সাথে সংযুক্ত হয়। সক্রিয় amino acid অ্যামাইনো অ্যাসাইল সিন্টেটেজ এনজাইমের প্রভাবে tRNA এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA যৌগ ও AMP উৎপন্ন করে। এইক্ষেত্রে tRNA প্রান্তের রাইবোজ সুগার এর – OH গ্রুপ এর সাথে এমাইনো এসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) কোভ্যালেন্ট bond এর মাধ্যমে যুক্ত হয়।
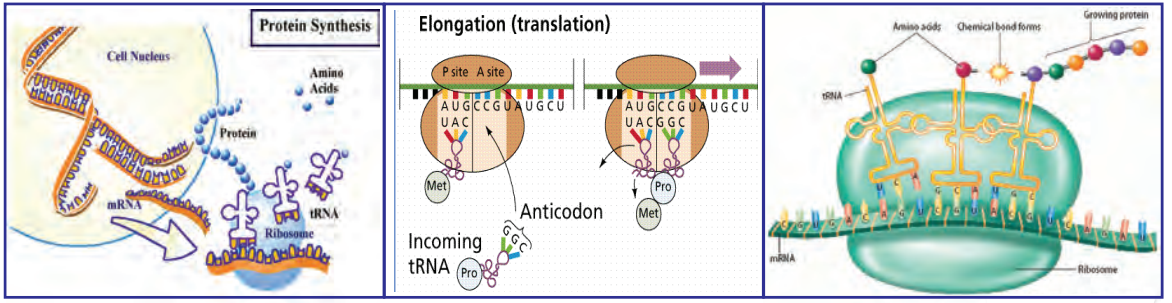
প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

অ্যামাইনো এসিডগুলো অ্যামাইনো এসিড সিন্থেটেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ATP এর সাথে যুক্ত হয়। রাইবোজোমের A-site (Amino acyl site) ও P site (Peptidyl site) নামক ২টি স্থান থাকে। mRNA এর প্রথম সংকেত AUG রাইবোসোমের A site এ অবস্থান করে। এর সাথে সংযুক্ত হয় UAC অ্যান্টিকোডন যা মিথিওনিন বহনকারী tRNA।

পরবর্তীতে এই tRNA A site হতে P site এ 5′ প্রান্তের দিকে সরে আসে ও পরবর্তী অ্যামাইনো এসিডের (ভ্যালিন) কোডন (GUU) A site এ পৌঁছায়। ভ্যালিনের tRNA এর অ্যান্টিকোডন CAA এর সাথে GUU এর সংযোগ সাধিত হয়।

পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ এনজাইমের প্রভাবে পাশাপাশি দুটি amino acid এর পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে ডাইপেপটাইড গঠন করে ও পরবর্তীতে tRNA amino acid মুক্ত হয়ে রাইবোজোম ত্যাগ করে। mRNA 5′ প্রান্তের দিকে ৩ ঘর সরে আসে। A স্থানের ডাইপেপটাইড যুক্ত tRNA P স্থানে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে নতুন amino acid বহনকারী tRNA A- site এ সংযুক্ত হয়।

এইভাবে একটি একটি করে amino acid সংযুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড চেইন গঠন সম্পন্ন হওয়ার পর Terminating code পলিপেপটাইড চেইন এর সমাপ্তি নির্দেশ করে। এর প্রভাবে tRNA এর সাথে যুক্ত পলিপেপটাইড চেইনটি P site থেকে আলাদা হয়ে যায় ও পরে পলিপেপটাইড বন্ড মুক্ত হয়ে tRNA পৃথক হয়ে যায়। পলিপেপটাইট চেইন পরবর্তীতে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রোটিন অণু তৈরী হওয়ার পর তা কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হয়।

মুক্ত tRNA সাইটোপ্লাজমে নতুন অ্যামাইনো এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে রাইবোসোমে এসে অন্যান্য প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ: কিভাবে প্রোটিন তৈরি হয়?

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ: ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটে বর্ণনা করে লিখে আনবে।

জিন (Gene) : ক্রোমোসোমের লোকাসে অবস্থিত DNA বা RNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকুয়েন্স যা জীবের একটি নির্দিষ্ট ‘কার্যকর সংকেত’ আবদ্ধ (encode) করে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় তাকে জিন বলে। আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী, জিন হচ্ছে DNA অণুর অংশবিশেষ যা একটি RNA অণু বা পলিপেপটাইড উৎপাদনের সংকেত বহন ও প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে।

জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য জিন নিয়ন্ত্রণ করে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে জোড়ায় জোড়ায় জিন অবস্থান করে। ১৯৪০ দশকে জানা যায় যে, জিন ক্রোমোসোমে অবস্থিত। যেসব চরিত্র বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের প্রত্যেকটি একেকটি আলাদা জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। জিনের রাসায়নিক বস্তুর নাম DNA।

চিত্র : জিনের গঠন

মেন্ডেল ১৮৬৬ সালে মটরশুঁটির জিনতাত্ত্বিক গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটি আজ জিন রূপে পরিচিত হয়েছে। জোহানসেন (Johansen) ১৯০৩ সালে 'জিন' শব্দের প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক কোষে দুটি সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোসোমে জিনগুলো দুই সেটে রৈখিকভাবে পরপর সজ্জিত থাকে। একটি জিন ক্রোমোসোমের যেখানে অবস্থান করে, তাকে লোকাস (locus) বলে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে T.H. Morgan প্রমাণ করেন যে কোন একটি নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানকেই লোকাস বলা হয়। বিজ্ঞানী Morgan একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত বিভিন্ন জিনকে লিংকড জিন নামে অভিহিত করেন। যাদের একসাথে লেগে থাকার প্রবণতা আছে এবং লিংকড জিনগুলো এক জনু থেকে পরের জনুতে একইসাথে যেতে চায়। মায়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোমগুলোর মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে লিঙ্কেজ গ্রুপের পুনঃর্বিন্যাস হয় অর্থাৎ মাতৃ ও পিতৃ ক্রোমোসোমের সংযোগে জিনের স্বতন্ত্র বিন্যাসে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্রোমোসোম তৈরি হয়। জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্ধারিত জিন থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে।

জিনের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) স্ববিভাজন (২) অন্য পদার্থের সৃষ্টি (৩) মিউটেশন।

একটি জিন সব সময় মাতৃ জিন থেকে তৈরি হয়। প্রতিটি জিন স্ববিভাজনের মাধ্যমে অনুরূপ জিনের সৃষ্টি করে। DNA-র অংশ জিন। DNA স্ববিভাজনের মাধ্যমে নতুন DNA সূত্র গঠন করে। DNA-র স্ববিভাজনের সময় ঐ সূত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ বার্তাও যথাযথভাবে নতুন DNA-তে যায় বলে এক জনু থেকে পরের জনুতে DNA-র গঠন সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে। এক জনু থেকে পরের জনুতে জিন অপরিবর্তিত থাকে। এর ফলেই সন্তান পিতামাতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

DNA অণুতে যে জিন অংশ রয়েছে তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষারক সংখ্যা ও ক্ষারক অনুক্রম (sequence) রয়েছে। এসব ক্ষারক অনুক্রমে বিশেষ বিশেষ অর্থবোধক সংকেত নিহিত থাকে। এ পর্যন্ত জানা ক্ষুদ্রতম জিনে ৭৫টি নিউক্লিওটাইড ও বৃহত্তম জিনে প্রায় ৪০,০০০টি নিউক্লিওটাইড সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। DNA অণুর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে সেখানে কয়টি জিন থাকতে পারে তা অনুমান করা যায়। DNA অণুসূত্রে জিন আকৃতিতে পরপর সজ্জিত কিন্তু কোনো প্রকার বাহ্যিক গঠনাকৃতিতে বিভক্ত নয়। একটি জিন DNA সূত্রের কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে তাও আকৃতিগতভাবে চিহ্নিত নয় কিন্তু নিউক্লিওটাইড অনুক্রমে সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেকটি জিনের নির্দিষ্ট DNA অংশ রয়েছে।

জিনের যে অংশ প্রোটিন সৃষ্টির জন্য সংকেত বহন করে, তাকে কোডিং অংশ (coding region) বলে। লিডার-অংশ জিনের কোডিং অংশ থেকে প্রায় ১০টি নিউক্লিওটাইড দূরত্বে অবস্থিত। কোডিং-অংশ ছাড়িয়ে বর্ধিত শেষাংশে অবস্থিত জিনের অংশকে নিম্নবাহ (down stream) বলে। কোডিং অংশ পার হয়ে নিম্নবাহের যে কিছুটা অংশ RNA-র অনুলিপন ঘটায়, তাকে অনুগামিক-অংশ (trailor region) বলে।

জিনগুলো সাধারণ নিয়মে DNA অনুসূত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথক ও রৈখিকভাবে পরপর সাজানো থাকে এবং স্বতন্ত্রভাবে সংকেত ব্যক্ত করে। তবে কিছু জিন গুচ্ছবদ্ধ হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং যৌথভাবে কাজ করে। গুচ্ছাকারে অবস্থিত জিনগুলো যখন এককভাবে অনুলিপিত হয় ও কাজ করে তখন একে অপেরণ (operon) বলে।

একটি গাঠনিক জিন (structrual gene) এর সাথে চালক (operator) ও উদ্দীপক (promoter) জিন নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এ তিন প্রকার জিনকে এক সাথে operon (অপেরন) বলে। যে জিন অপেরনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে নিয়ন্ত্রক জিন (regulator gene) বলা হয়।

সুকেন্দ্রিক কোষের ক্রোমোসোমস্থ জিনের ক্রিয়া–কৌশল অপেক্ষাকৃত জটিল। এই ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয়, হেটেরোক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয় না। যে জিন থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের সংকেত (mRNA) ব্যক্ত করে তাকে স্ট্রাকচারাল জিন (Structrual gene) বলে। জিনের মধ্যে যে ননকোডিং-অংশ থাকে, তাকে ইনট্রন (intron) এবং কোডিং-অংশকে এক্সন (exon) বলে।

চিত্র : ১.২২ : Central Dogma -র পরিলেখ

জিন হচ্ছে জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের আধার। Crik (১৯৫৬) এর সেন্ট্রাল ডগমা (Central Dogma) অনুযায়ী জিনের বৈশিষ্ট্য যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে (১) DNA অনুলিপনের (Replication) মাধ্যমে তার অবিকল আকৃতি সংশ্লেষণ করে বিভাজন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়। ফলে জিনের গঠন অক্ষুন্ন থেকে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। (২) DNA অণুর যে যে অংশ নিয়ে জিন গঠিত কেবল সে সব অংশ ব্যক্ত হলে সেখানে একটি সংকেত বাহক সূত্র ছাঁচ হিসেবে অংশগ্রহণ করে। সে অংশের ক্ষারকের পাঠক্রম অনুযায়ী অনুলিপন (transcription) ঘটে RNA সৃষ্টি হয়। এখানে প্রধানত rRNA, tRNA ও mRNA সৃষ্টি হয়। (৩) সৃষ্ট RNA গুলো তখন অর্থকরণের (translation) জন্য তৎপর হয়। স্ট্রাকচারাল জিনের সংকেত বহনকারী অংশে যে ক্ষারক রয়েছে তার পাঠক্রম অনুযায়ী mRNA অণুসূত্র সজ্জিত হয়। mRNA তখন rRNA (যা রাইবোসোম গঠন করে) ও tRNA অণুর সহায়তায় কোডিং অংশের পাঠক্রম অনুযায়ী অর্থকরণ করে। অর্থকরণ শেষে যে উপাদান সৃষ্ট হয় তা হচ্ছে প্রোটিন। (৪) সৃষ্ট প্রোটিন তার আকৃতি-প্রকৃতি (অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রম ও সংখ্যা) অনুযায়ী কোষের গঠন, বিপাক, প্রজনন, বৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় জৈবনিক কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন করে একটি জীবের দেহচিত্র ফুটিয়ে তোলে যাকে ফিনোটাইপ (phenotype) বলে। সৃষ্ট প্রোটিনের কিছু বিশেষ অণু এনজাইম হিসেবে সক্রিয় হয়ে বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
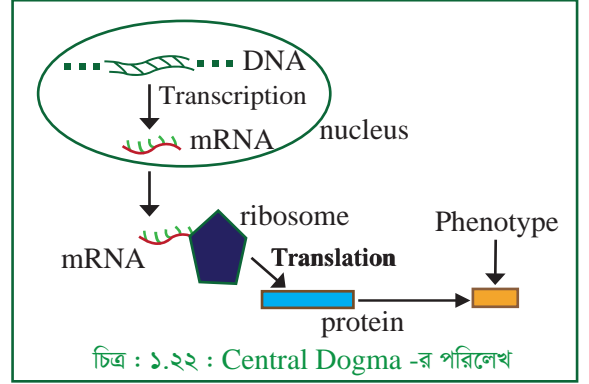
DNA অণুতে জিনগুলো প্রয়োজনে সক্রিয় ও অপ্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় থাকে। জিনের এ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় থাকা অবস্থাকে জিনের 'Ad' ও 'Ab' (Off and On) অবস্থা বলে যা এনজাইম প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। আবার কিছু জিন রয়েছে যারা কখনও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় না থেকে কোষের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, তথা এনজাইম সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত বিপাক ক্রিয়া সচল রাখে। যে সব জিন কখনও বন্ধ না থেকে প্রতিনিয়ত কোনো এনজাইম বা প্রোটিন সৃষ্টি করে তাকে হাউজ কিপিং (house keeping) জিন বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে (ইউক্যারিওট জীবে) জিনগুলো স্বতন্ত্র। এককেকটি জিন স্বতন্ত্র প্রকৃতির এনজাইম বা প্রোটিন তৈরি করে থাকে। এ এনজাইমগুলো বিপাক ক্রিয়ায় এককেকটি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন জিন থেকে সৃষ্ট এনজাইমগুলোর সমন্বিত সামগ্রিক বিক্রিয়া শেষে একদিকে যেমনি বিক্রিয়ার ধারা চালু থাকে তেমনি জীবের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে এবং তা স্থায়ী বাহ্যিক রূপ লাভ করে যাকে ফিনোটাইপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জিন ও এনজাইম সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ় ও জটিল। একদিকে জিন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এনজাইম সংশ্লেষণ করে জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও পরিস্ফুটন ঘটায় তেমনি তার নিজে নিষ্ক্রিয়তা, সক্রিয়তা ও বংশবৃদ্ধি (রেপ্লিকেশন) ঘটাতেও এনজাইম অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ জিন থেকে এনজাইমের সৃষ্টি হয় আবার সৃষ্ট এনজাইমের কিছু অংশ জিনের কার্যকলাপকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ:

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
জিনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?	জিন কীভাবে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়?

জেনেটিক কোড

জেনেটিক কোড : m-RNA এর তিনটি ক্ষার মিলে একটি কোডন হয় যা প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা, সমাপন ও ২০টি এমাইনো এসিডের যে কোনো একটিকে সুনির্দেশ করে। কোষের নিউক্লিয়াসে উপস্থিত DNA দ্বারাই কোষের সাইটোপ্লাজমে কখন কোন প্রোটিন তৈরী হবে তা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চিত্র : জেনেটিক কোড
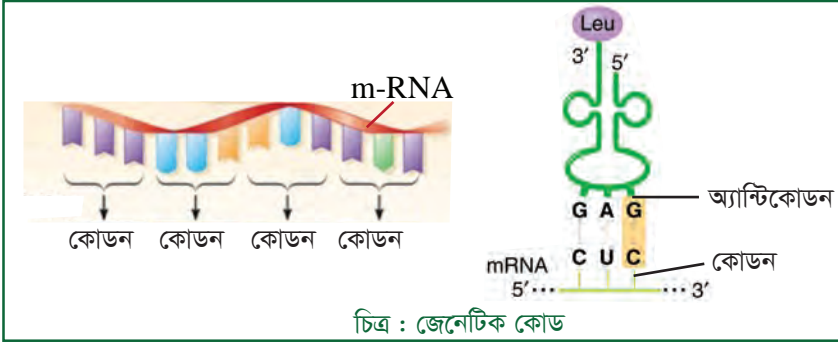
DNA এই নিয়ন্ত্রণটি m-RNA এর মাধ্যমেই করে থাকে। আর DNA কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ m-RNA এর ক্ষারক সমূহের মধ্যে ধরে রাখে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় কি প্রকার প্রোটিন সংশ্লেষিত হবে তা এর তিনটি ক্ষারককে একটি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে বার্তাটি সরবরাহ করে। যেমন প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা AUG, সমাপনি UAA, UAG ও UGA এবং UUU-ফিনাইল এলানীন, CUA লিউসিন, GUA ভ্যালিন ইত্যাদি এমাইনো এসিড নির্দেশ করে।

জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্য: জেনেটিক কোড তৈয়ারি প্রকৃতির হয় (triplet in nature) অর্থাৎ প্রতি তিনটি নিউক্লিওটাইডের সুনির্দিষ্ট সমন্বয়ে একটি কোডন হয়। কোড কমা বিহীন (commaless) কোড কখনই ওভারলেপ করে না (non overlapping)। কোড ডিজেণারেট ধরনের হয়, অর্থাৎ একাধিক কোডন একটি এ্যামাইনো এসিডকে (মথিওনিন ও ট্রিপটোফেন) ছাড়া নির্দেশ করিতে পারে। ৬৪% কোডনের মধ্যে ৬১টি কার্যকর কারণ এরা কোন না কোনো এমাইনো এসিডকে নির্দেশ করে, বাকী তিনটি UAA, UGA ও UAG কার্যকর নয়। AUG প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা ও UAA, UGA এবং UAG প্রোটিন সংশ্লেষণের সমাপনি নির্দেশ করে। জেনেটিক কোড প্রায় বিশ্বজনীন (universal) অর্থাৎ দু'একটি সিস্টেম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোডের ধরন একই ধরণের।

সেন্স কোড, সিগন্যাল কোডন ও এন্টিকোডন : যে সকল কোডনগুলো অ্যামিনো এসিডের সংশ্লেষণকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে সেন্স কোডন বলে। ৬৪টি কোডনের মধ্যে ২০টি অ্যামিনো এসিড সংশ্লেষণের জন্য ৬১টি সেন্স কোডন বিদ্যমান। যেসব কোডগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় অ্যামিনো এসিড তথা পলিপেপটাইড চেইন সংশ্লেষণের শুরু বা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে, তাদেরকে সিগনাল কোডন বলে। সিগনাল কোডনগুলো দুই প্রকার। যথা:

১. সূচনাকারী কোডন (Start or Initiation codon) : যে কোডনটি প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় অ্যামিনো এসিড তথা পলিপেপটাইড চেইন সংশ্লেষণের শুরু করার সংকেত প্রদান করে, তাকে সূচনাকারী কোডন বলে। যেমন-AUG একটি সূচনাকারী কোডন।

২. সমাপনী কোডন (Stop বা Termination coden) : যেসব কোডন প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় অ্যামিনো এসিড তথা পলিপেপটাইড চেইন সংশ্লেষণের বন্ধ করা নির্দেশ বা সংকেত প্রদান করে, তাদেরকে সমাপনী কোডন বলে। সমাপনী কোডন ৩টি; যথা UAA, UAG এবং UGA। এরা কোন অ্যামিনো এসিড সংশ্লেষণে সরাসরি কোনো ভূমিকা পালন করে না, এজন্য একে নন-সেন্স কোডন বলে।

এন্টিকোডন (Anit-codon) : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় DNA কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ mRNA তার নিজস্ব তিনটি নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে ধারণ করে কোডন তৈরি করে। তারপর এটি নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়ে আসে এবং tRNA কর্তৃক পরিবাহিত হয়ে রাইবোজোমে চলে আসে। এ সময় mRNA কর্তৃক আনীত সংবাদের পাঠ উদ্ধার করার জন্য tRNA এর বেসসমূহ mRNA বেসসমূহের সাথে যে বিশেষ বিন্যাস তৈরি করে তাকে এন্টিকোডন বলে। এন্টি কোডনগুলো সাধারণত ৩´ - ৫´ কারণ কোডনগুলো ৫´ - ৩´। কোনো একটি জীবে এন্টিকোডনের সংখ্যা সমসময়ই কোডনের সংখ্যার বেশি হয়ে থাকে। ফলে এন্টিকোডনগুলোকে একাধিক কোডনের সাথে জোড় গঠন করতে হয়। যেমন– AUG ৫´ - ৩´ কোডনের এন্টিকোড হলে UAC ৩´ - ৫´।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজঃ

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি
জিন ও জেনেটিক কোড কী?	জিন ও জেনেটিক কোড কি কাজে লাগে।

শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজঃ জেনেটিক কোডের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করে লিখে আনবে।

বংশগতীয় বস্তু হিসেবে RNAএর অবদান

বংশগতীয় বস্তু হিসেবে RNA এর অবদান বা RNA-এর ভূমিকা ঃ RNA বংশগতির রাসায়নিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। RNA ও এনজাইম জিন কর্তৃক তৈরি হয়। এরা জীবের অধিকাংশ জৈবিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এসবের নিয়ন্ত্রণে জিন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। বংশগতি বস্তু হিসেবে RNA-র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, DNA অণুতে অবস্থিত জিন যখন কোনো চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখন তা প্রথমে RNA অণুতে ব্যক্ত করে। সৃষ্ট RNA অণু জিনের প্রতিবিম্ব স্বরূপ সক্রিয় হয়। RNA অণুসমষ্টি তখন সুনিয়ন্ত্রিত জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে (transcription) প্রোটিন তৈরি করে যা পরবর্তীতে জীবের বংশগতি বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে।

Key words ভিত্তিক সার সংক্ষেপ

কোষ : প্লাজমা পর্দাবেষ্টিত এবং নিউক্লিয়াস নিয়ন্ত্রিত একখণ্ড সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলে।

কোষ বিদ্যা : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোষের পদার্থিক বা ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, জৈবিক কার্যাবলি, বিকাশ, পরিস্ফুরণ, কোষ অঙ্গাণুর গঠন এবং বিভাজন দ্বারা পূর্বতন কোষ থেকে নতুন কোষের উৎপত্তি প্রভৃতি অর্থাৎ এক কথায়, কোষ সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বা Cytology বলা হয়।

প্লাজমোডেসমাটা (plasmodesmata): পাশাপাশি থাকা দুটি কোষের মধ্যে কোষ প্রাচীরের কূপ অংশে সাইটোপ্লাজমের যোগসূত্র রচনার স্থানকে প্লাজমোডেসমাটা (plasmodesmata) বলে।

লিপোপ্রোটিন : লিপিড এবং প্রোটিনের সমন্বয়ের গঠিত প্রোটিনকে লিপোপ্রোটিন বলে।

ইউক্রোমাটিন : নিউক্লিয়াসকে রঞ্জিত করলে যে অংশটি হালকা রং ধারণ করে তাকে ইউক্রোমাটিন অঞ্চল বলে।

হেটারোক্রোমাটিন : নিউক্লিয়াসকে রঞ্জিত করলে যে অংশটি গাঢ় রং ধারণ করে তাকে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল বলে।

জেনেটিক কোড : m-RNA এর তিনটি ক্ষার মিলে একটি কোডন হয় যা প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা, সমাপন ও ২০টি এমাইনো এসিডের যে কোনো একটিকে সুনির্দেশ করে।

নিউক্লিওসাইড : এক অণু নাইট্রোজেন ক্ষারক ও এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার যুক্ত হয়ে গঠিত গ্লাইকোসাইড যৌগকে বলা হয় নিউক্লিওসাইড।

নিউক্লিওটাইট : এক অণু নিউক্লিওসাইড-এর সাথে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু নিউক্লিওটাইট।

ট্রান্সক্রিপশন : জীবের দ্বিসূত্রক DNA থেকে একসূত্রক mRNA সংশ্লেষ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ট্রান্সক্রিপশন বলে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বিসূত্রক DNA অণুর জেনেটিক তথ্য এক সূত্রক mRNA তে স্থানান্তরিত হয়।

ট্রান্সলেশন : mRNA তে বিদ্যমান বংশগতি সংকেতসমূহকে ভিত্তি করে প্রোটিন অণুর সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নাম ট্রান্সলেশন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ কোষ সণাক্তকরণের অঙ্গাণু কোনটি?

ক. নিউক্লিয়াস খ. মাইটোকন্ড্রিয়া গ. ক্লোরোপ্লাস্ট ঘ. রাইবোসোম

২। পানিশূন্য অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে কোনটি?

ক. সাইটোপ্লাজম খ. নিউক্লিয়াস গ. প্রোটোপ্লাজম ঘ. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

৩। প্রাণিকোষে কোন অঙ্গাণুর পরিমাণ বেশি থাকে?

ক. রাইবোসোম খ. লাইসোসোম গ. মাইটোকন্ড্রিয়া ঘ. গলগি বস্তু

৪। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোষেই পাওয়া যায়–

i. নিউক্লিয়াস ও কোষঝিল্লী

ii. মাইটোকন্ড্রিয়া ও মাইক্রোভিলাই

iii. কোষপ্রাচীর ও কোষঝিল্লী

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i, ii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

৫। জেনেটিক কোড কয় ক্ষারক যুক্ত?

ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

৬। কোন অঙ্গাণুটি ট্রান্সলেশান এর সাথে সম্পর্কযুক্ত-

ক. মেসোসোম খ. লাইসোসোম গ. রাইবোসোম ঘ. সেন্ট্রোসোম

৭। প্রোক্যারিওটিক রাইবোসোম কোন প্রকৃতির?

ক. 50 s খ. 70 s গ. 80 s ঘ. 100 s

৮। ক্লোরোপ্লাস্টে যে সব বর্ণকণিকা থাকে-

ক. ক্লোরোফিল খ. জ্যান্থোফিল গ. ক্যারোটিন ঘ. উপরের সবগুলো

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফিন্নি খাওয়ার সময় রুবেলের ফিন্নির বাটিতে মা একটি মিষ্টি দিল। ফিন্নির বাটির মাঝখানে ফিন্নিতে ভাসমান এই মিষ্টি রুবেলের কাছে তার প্রাণিবিজ্ঞান বইয়ে পড়া একটি কোষীয় উপাদানের কথা মনে করিয়ে দিল। তার আরও মনে হল এই উপাদানটি আজকের জীব প্রাচুর্যতার জন্য দায়ী।

ক. কোষ কী?

খ. মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের শক্তিঘর বলা হয় কেন?

গ. রুবেলের পর্যবেক্ষণকৃত কোষীয় উপাদানটির রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. রুবেলের কেন মনে হল উল্লিখিত উপাদানটি জীব প্রাচুর্যতার জন্য দায়ী?- বিশ্লেষণ কর।

২। সানির চোখ জোড়া আটকে আছে 'ডিস্কভারি বাংলা চ্যানেলে' চলমান একটি অনুষ্ঠানে। সে দেখল প্যাচাঁনো সিড়ির মত একটি বস্তু, যা এক সূত্রাকার বা দ্বিসূত্রকার গঠন বিশিষ্ট্য বৈচিত্র্য যা আমাদের জগৎকে করেছে বৈচিত্র্যময়।

ক. নিউক্লিওটাইড কী?

খ. রাইবোসোমকে প্রোটিনের ফ্যাক্টরি বলা হয় কেন?

গ. সানির দেখা উপাদান দুটির মধ্যে গঠনগত ও কার্যগত পার্থক্য নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বস্তু ২টির সাথে বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৩। চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
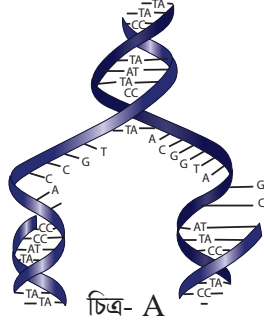
চিত্র- A

ক. কোষীয় অঙ্গাণু কী?

খ. ব্যাকটেরিয়াকে আদি কোষ বলা হয় কেন?

গ. চিত্র A এর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি না ঘটলে জীবজগতের কীরূপ অবস্থা হবে বলে তুমি মনে কর।- বিশ্লেষণ কর।

৪। চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
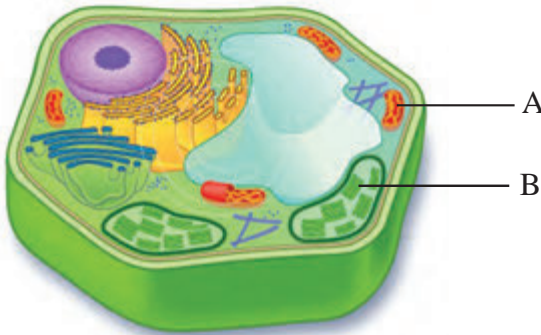
ক. রাইবোজোম কে আবিস্কার করেন?

খ. লাইসোজমকে আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় কেন?

গ. চিত্র A ও B এর মধ্যে কার্যগত সম্পর্কের নির্ভরশীলতা উল্লেখ কর।

ঘ. A এর কার্যকলাপ ব্যাতিরেকে চলমান জীব জগৎ কল্পনাহীন - মূল্যায়ন কর।